বাতায়ন

কাগজের নৌকা

বাতায়ন

কাগজের নৌকা

২৫তম সংখ্যা, মে ২০২৪

সম্পাদনা
সঞ্জয় চক্রবর্তী

Issue Number 25 : May, 2024

Editor
Sanjoy Chakraborty
Sydney

Group Editor
Ranjita Chattopadhyay
Chicago

Sub Editor
Sugandha Pramanik
Sydney

Design and Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata

Website Design and Support
Susanta Nandi, Kolkata

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Concept & Production
Anusri Banerjee

Photo & Artwork Credit

Saumen Chattopadhyay
IL, USA

Front & Back Cover
Venice is pretty

Saumen is an avid outdoor enthusiast and enjoys hiking, trekking, and photography. He also takes part in recitation, drama, mind science. Saumen is an entrepreneur in the field of investment research and portfolio management. He lives in Chicago.

Srijato

Front Inside Cover
অস্ট্রেলিয়া সফর ২০২৩

শ্রীজাত – কবি, গীতিকার, গদ্যকার ও চলচ্চিত্র পরিচালক। বাংলা ভাষার অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবি। বাংলা আকাদেমি ও আনন্দ পুরস্কার সহ বহু পুরস্কারে সম্মানিত। দেশে বিদেশে বহু জায়গায় কবি হিসেবে আমন্ত্রিত।

Supriya Ghosh

Title Page
সোয়ান নদীর ধারে

Supriya Ghosh has a PhD in English and has been teaching Academic and General English, Writing and Editing, to international students for several years. Her objective is to provide enough English to her learners to enhance their social life and career goals. A keen observer of Natural beauty in its myriad forms, she holds an almost pantheistic awe of Nature. Lives in Perth, Australia.

Tirthankar Banerjee

Back Inside Cover
অস্ট্রেলিয়ার পার্থে বসন্ত

His interest in photography started in student days. Much later the long nights in the dark-room were replaced by hours behind the computer and focus shifted from Black & White to Colour. He likes to show the images as they are and does not approve of computer gimmickry. He loves nature – flowers, birds, trees and all things beautiful. Tirthankar is an engineer, specializing in Renewable Energy and lives and works in Perth, Western Australia.

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

অ্যানা স্বেতনিনা'র নাম হয়তো অনেকেরই অজানা থাকবে। ১৯০৮ সালে তৎকালীন জারের সাম্রাজ্য রাশিয়ায় জন্মেছিলেন এই প্রবাদপ্রতিম মহিলা। মাত্র সাতাশ বছর বয়েসে হয়েছিলেন পৃথিবীর প্রথম মহিলা ক্যাপ্টেন সমুদ্রগামী জাহাজের। এম ভি বেলোস্ত্রভ, এম ভি পেস্কস ইত্যাদি বিভিন্ন রুশ জাহাজ নিয়ে তিনি পূর্ব রাশিয়ার ভ্লাদিভোস্তক বন্দর থেকে পশ্চিম ইউরোপের হামবুর্গ ইত্যাদি বন্দর পাড়ি দিতেন সমুদ্র পথে। সাগর ও মহাসাগরের ঢেউ ভেঙ্গে লম্বা সফর শেষে পণ্য ও সামগ্রী নিয়ে নোঙর ফেলতেন।

প্রকাশিত হলো পাঠকের প্রিয় কাগজের নৌকার পঁচিশতম সংখ্যা। সময় ও অপেক্ষার ঢেউ ভেঙ্গে সেও পাঠকের মনের বন্দরে নোঙর ফেলতে চলেছে দেশ বিদেশের লেখক ও লেখিকাদের গল্প, কবিতা ও উপন্যাস নিয়ে, প্রতিবারের মতো।

সদ্য পেরিয়ে এসেছি আমরা পঁচিশে বৈশাখ, উদযাপন করেছি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তী। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "মনুষ্যত্বের শিক্ষাটাই চরম শিক্ষা আর সমস্তই তার অধীন"। বাতায়ন আজও তাঁর মতাদর্শকেই মেনে চলেছে প্রতিবার কাগজের নৌকার রূপায়ণে।

অ্যানা পৃথিবীর প্রথম মহিলা ক্যাপ্টেন হওয়ার পাশাপাশি ছিলেন সুলেখিকা, সদস্য ছিলেন ইউনিয়ন অফ রাশিয়ান রাইটার্সের। অ্যানা প্রমাণ করেছেন নৌকা বা জাহাজের সঙ্গে সাহিত্যের কোথাও এক অদৃশ্য যোগ রয়ে আছে। আর কে না জানে রবীন্দ্রনাথের বহু অমর সাহিত্যের জন্ম হয়েছে জাহাজে, বিদেশের যাত্রা পথে। সারা জীবন অ্যানা ছিলেন ভ্লাদিভস্তকবাসীর ভীষণ প্রিয় একজন মানুষ।

আশা করবো প্রতিবারের মতো এবারের কাগজের নৌকার পঁচিশতম সংখ্যা পাঠকের ভালোবাসা পেতে সক্ষম হবে।

সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, কাগজের নৌকার সঙ্গে থাকবেন, ব্যস এইটুকুই ...

সঞ্জয় চক্রবর্তী
সিডনি

সূচীপত্র

ধারাবাহিক গল্প

দেবীপ্রিয়া রায়	**পুজো আচ্চা নিয়ে আড্ডা**	৫
রমা জোয়ারদার	**চার বুড়ির গল্প**	১৬

ধারাবাহিক উপন্যাস

ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায়	**ছায়া সীমানা**	২৯
স্বপ্না মিত্র	**পাহাড় চুড়ো**	৪৯

গল্প

ময়ূরী মিত্র	**চাঁদমৃত্তিকা**	২৬
অভিজিৎ মুখার্জী	**একটি চুরির গল্প**	৬১

পুজো আচ্চা নিয়ে আড্ডা

পর্ব ১

দেবীপ্রিয়া রায়

আসুন একটু সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষার খেলা খেলে আড্ডা শুরু করি। আচ্ছা, আপনি কয়টি পার্বণের নাম জানেন একটু মনে করতে চেষ্টা করুন। ভাবতে পারেন, এ আবার কিরকম উদ্ভট কথা – আমরা বাঙালী, আমাদের যে বারো মাসে তেরো পার্বণ, এ তো ছেলেপুলেতেও জানে। তাহলে ? না না রাগ করবেন না – মেনেই নিচ্ছি যে আপনারা সক্কলে খাঁটি বাঙালী, ওই তেরো পার্ব্বনের সক্কলে খবর রাখেন, কিন্তু আমার প্রশ্ন হল যে সেই সব কটি পার্বণের নাম ধাম রীতি নীতি সব কি আপনাদের মনে আছে? মানে নতুন জামা পরে ঠাকুর দেখা, অঞ্জলি দেওয়ার দরুণ দুর্গা পুজো, অবশ্য কেউ ভোলে না। তেমনি কুল না খেয়ে, বই সাজিয়ে বিদ্যালাভের আশায় মা সরস্বতীর পায়ে অঞ্জলি দেওয়াতে সরস্বতীপূজাটাও মনে থাকে আর বাজী পটকার ধুম ধাড়াক্কাতে কালী পুজো ভুলে যাওয়া অসম্ভব। ছেলেবেলার ঘুড়ি ওড়ানোর আনন্দের কথা মনে পড়লে বিশ্বকর্মা পুজোও মনে পড়ে যায়। এসব পুজোর দিনে ছুটি-টুটিও পাওয়া যায়, মানে আমাদের কালে তো যেত। এর বাইরে জন্মাষ্টমী, দোল, শিবরাত্রি, নীলের গাজন আর বড় জোর পয়লা বৈশাখে হালখাতা মানে নববর্ষ। গুনে দেখুন, তেরোটি হল কি ? বোধ হয় না। অবশ্যি আজকাল তো শুনি উত্তর পশ্চিম ভারতে প্রচলিত ছট, গণেশ চতুর্থী, রামনবমী – এই সব ব্রত পার্বণও পশ্চিম বঙ্গে লোকেদের মনোহরণ করেছে – সে অবশ্য ভালোই। ব্রত পার্বণ তো আর সিন্দুকে তুলে রাখা রূপোর বাসন নয়, যে তালাবন্ধ হয়ে আটকে থাকবে। এক জায়গার লোক আরেক জায়গায় গেলে সাথে সাথে তাদের নিজেদের পুজো পার্বণটিকেও সাথে করে নিয়ে যায়, তারপর নতুন জায়গাটিতেও সে ব্রত জায়গা করে নেয়। এ ছাড়াও নানান ছুটকো ছাটকা ব্রত এ তো সব পরিবারেই কখনো সখনো হয়েই থাকে। তাই বলা যায়না, হয়তো আপনি এবং আরো অনেকেই এদিক ওদিক করে কুড়িয়ে বাড়িয়ে গোটা পঞ্চাশেক ব্রত পার্বণের নাম মনে করে ফেলতে পারলেন। তার বেশী হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয় – মানে আমাদের ঠাকুর দেবতার সংখ্যাও তো নেহাৎ কম নয় – অফিসিয়ালি হিসাবেই তিনশো তেত্রিশ কোটি, তাছাড়া গাঁয়ে গঞ্জে কত ঠাকুরের থান, কত গাছের তলায় কতরকম ঢেলা বা কাপড় বেঁধে মানত করা – এঁদের সকলের পুজো ব্রত যোগ করতে গেলে তিনশো তেত্রিশ কোটি ব্রত পার হয়ে যেতেই পারে।

কিন্তু এইখানে আরেকটা কথা – এতো এতো ব্রত পর্ব, যার হিসাব রাখাই দায়, সেসব আমরা পেলাম কোথায় ! না না – বিরক্ত হবেন না বা রেগে উঠবেন না যেন – এক্ষুণি হয়তো বা বলে বসবেন যে, "কোথায় থেকে আবার ? তুমি তো আচ্ছা বোকা হে বাপু, তুমি যে দেখি হিন্দু ধর্মের কিছুই জানোনা। এই অজস্র ঠাকুর দেবতা, পুজো পাঠ – সবই তো আমাদের হিন্দু ধর্মের অঙ্গ।" তা, হিন্দু ঘরের মেয়ে – পুজোপাঠ দেখেই তো বড় হলাম, তাই ঐ উত্তরটা আমারও একটু একটু জানা। কিন্তু তাই দিয়ে তো আমার মুশকিল আসান হলনা, মানে এই এসব পুজো এলো কোথা থেকে সে প্রশ্নের জবাব পাচ্ছিনা। আমাদের হিন্দু ধর্মের আকর তো বেদ আর উপনিষদ বলেই জানি, সেই বেদ যা নাকি আর্য ঋষি মুনিরা সংস্কৃত ভাষায় লিখে গিয়েছেন – সেসব গ্রন্থে এদের সব কথা কি লেখা আছে ? এইখানে এসেই এই আলোচনাটা নিয়ে একটু মুশকিলে পড়ে গিয়েছি বুঝলেন? পন্ডিতেরা দেখি বলেছেন যে আমাদের এই বাংলাদেশে যতদিনে আর্যরা এসেছেন – তা ছিল প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ শতাব্দী নাগাদ, ততদিনে এই জলে জঙ্গলে ভরা, জায়গাটিতে অন্যান্যরা বসতি স্থাপন করে ফেলেছিলেন ও নিজেদের রীতিনীতি নিয়ে তাঁদের দিব্যি একটি সমাজ গড়ে উঠেছিল।

কতদিন আগে থেকে মানুষজন এখানে এসেছেন, সেটা শুনলে চমকে যাবেন – মানে আমি তো চমকেই গিয়েছিলাম। ২০০৮ সালে মুর্শিদাবাদ থেকে মাটি খুঁড়ে ২০,০০০ বছর পুরোনো মাটির বাসন কোসন পাওয়া গিয়েছিল। সেখানেই শেষ নয় – তার পরে পুরুলিয়া অঞ্চলের অযোধ্যা পাহাড়ে আবার ৪২,০০০ বছর পুরোনো মানুষের ব্যবহারের জিনিস পত্র মিলেছে। তবেই বুঝুন যে সেই কোন কাল থেকে গিন্নীরা যেমন কড়াইতে একটু ফোড়ন সম্বরা দিয়ে একটি একটি করে

তরকারী ঢেলে নেড়ে চেড়ে উল্টে পাল্টে পাঁচমিশালী তরকারী রাঁধেন, তেমনি করে বিধাতা পুরুষ নানা দিক হতে নানা গোষ্ঠীর মানুষকে এই বঙ্গভূমে এনে মিলিয়ে মিশিয়ে বাঙালী গোষ্ঠী ও তার সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছেন। শুনলে তাজ্জব হবেন যে এখানে প্রথম পা ফেলেছিলেন যাঁরা, তাদের গণনা করা হয় পৃথিবীর আদিমতম জনজাতিদের মধ্যে। অবশ্য বিশেষ কোন একটি জায়গা হতে তাঁরা আসেননি। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকার নানা জায়গা থেকে নানা পথ ঘুরে নানা সময়ে তাঁরা এই বাংলার মাটিতে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন; আমাদের ভাষা, আমাদের সংস্কৃতি, এবং আমাদের ধর্ম আচরণ – সবেতেই আমরা সেই সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে আসা আদিম জনজাতির চিহ্ন বয়ে নিয়ে চলেছি।

কারা সেই সব জনজাতি বা নৃতত্ত্ববিদের ভাষায় কোম ? তারা সকলে তো এক সময় আসেনি। তাদের মধ্যে প্রথম যারা এসেছে, তারা এক লক্ষ চল্লিশ হাজার বছর আগে রওনা হয়েছিল আফ্রিকা থেকে – নৃতত্ত্ববিদের ভাষায় তাদের নাম নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু। এরাই ৪০,০০০ বছর আগে বাংলায় ঘর বসতি বসায়। আজ এতদিন পর অবশ্যি তাদের আলাদা করে চিহ্নিত করা কঠিন। তবে ঐতিহাসিক নীহার রঞ্জন রায়ের মতে বাংলার পশ্চিমের রাজমহল পাহাড়ের অধিবাসীরা, সুন্দরবনের অধিবাসী জেলেরা, অবিভক্ত বাংলার ময়মনসিংহ, যশোহর জেলার নিম্নবর্গীয় লোকেরা এদের উত্তরপুরুষ।

বলা হয় যে বাংলার সেই প্রথম অধিবাসীরা ছিল কৃষিজীবী, অর্থাৎ তারা চাষবাস করে জীবন কাটাত; এবং সেই জন্যই পৃথিবীর উর্ব্বরা শক্তিকে বাড়িয়ে তোলার জন্য নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ করত। কেমন ছিল সেই ক্রিয়াকলাপ? সেই গল্পটি করার আগে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে সেই আদিম যুগ হতেই জনজাতির লোকেরা বিশ্বাস করত যে প্রকৃতি ও প্রাণী জগৎ অদৃশ্য একসূত্রে বাঁধা – একটিই শক্তি চক্রাকারে দুটির মাঝে ঘুরছে – সেই শক্তি দুটিকেই চালায়। মাটিতে সন্তানরূপ ফসল জন্মায়, মাটি বা পৃথিবী তাই তাদের চোখে ছিল মা – তাই তারা বিশ্বাস করত যে প্রজনন ক্ষমতা নারীকে মা করে, সেই ক্ষমতাই মাটিকেও করে উর্বরা। আর সেই কারণে নাচ গান, প্রার্থনার মাধ্যমে তারা ফসল বপন করার সময়ে প্রকৃতির মধ্যে সে একই উর্বরা শক্তিকে উদ্দীপিত করত। অনেক ক্ষেত্রে ফসল বপন করার মুহূর্তে ক্ষেতের মধ্যে তারা স্ত্রী পুরুষে শারীরিক ভাবে মিলিত হত, কারণ তাদের মনে হত যে এই মিলনের ফলে ক্ষেতের জমিটি হবে ফলবতী। ফসল তোলার পরেও তারা সেই জমিকে পূজার মাধ্যমে ধন্যবাদ জানাত। শুনতে আশ্চর্য লাগলেও আজও পৃথিবীর নানান আদিবাসী গোষ্ঠী এই নিয়মটি পালন করে। আমাদের বাংলার কিছু কিছু আদিবাসীদের মাঝেও এর প্রচলন আজ ও রয়েছে। জানি এখানে আপনারা যারা পড়ছেন, তারা বিরক্ত হয়ে বলবেন, "এর সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক ? আমরা সভ্য, সুসংস্কৃত – ধান চাষ টাশ নিয়ে খোলা মাঠে ঐসব কান্ড – জীবনেও শুনিনি।" কিন্তু দাঁড়ান, আরেকটু শুনে যান – আসামে কামাখ্যা মন্দিরে অনেকেই হয়তো গিয়েছেন, বা না যেতে পারলেও তার কথা শুনেছেন। ওই মন্দিরে আরাধ্যা দেবী কামাখ্যার মূর্তি নয়, রয়েছে যোনি আকৃতির একটি পাথর, যার মধ্যে হতে ভূগর্ভ হতে ঝিরিঝিরি জল বয়ে আসে – বিশ্বাস করা হয় যে আদি মাতা হতে যে সৃষ্টির উৎপত্তি, সেটিই ওই যোনিস্থল। প্রতিমাসে মন্দির তিন দিন বন্ধ রাখা হয়, কারণ মাতা সেই সময় অন্যান্য নারীদের মতই রজঃস্বলা হন। প্রতিবছর আষাঢ় মাসের সপ্তম দিনে, মানে বর্ষার জল যখন শুকনো মাটি ভিজিয়ে দেয়, তখন মন্দিরের সেই জল রাঙা হয়ে ওঠে, যা লোক বিশ্বাসে রজঃস্বলা মাতার রক্তধারা বলে প্রচলিত। ঋতুমতী ধরিত্রী মাতা তখন গর্ভধারণে প্রস্তুত হন আর তাঁর বুকে আগুন জ্বালিয়ে কষ্ট না দিয়ে তাঁকে শীতল রাখার চেষ্টায়। আমাদের বাঙালী পরিবারের বিধবারা অম্বুবাচী ব্রত পালন করতেন। শহরে না হলেও হয়তো গাঁয়ে ঘরে এখনো করে থাকেন। ওই তিন দিন তারা উনুন ধরেন না। ছোটবেলায় দেখেছি যে তাঁরা সাবু মাখা, ফলমূল এই সব খেয়ে থাকেন (তবে শুধু বিধবারাই বা এ ব্রত করেন কেন, আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না, কারণ আমি অত জানিনা। বোধহয় তাঁদের উপর নিয়ম নিষ্ঠার ভার চাপিয়ে দেওয়া সহজ ছিল) এখন অম্বুবাচী কথাটিই এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'অম্ব' ও 'বাচি' থেকে। 'অম্ব' শব্দের অর্থ হল জল এবং 'বাচি' শব্দের অর্থ হল বৃদ্ধি। মানে দারুণ গরমের পর বর্ষার জলে যখন মাটি ভিজে উঠে বীজধারণের যোগ্য হয়ে ওঠে সেই সময়কেই বলা হয় অম্বুবাচী। আবার ভাদ্র মাসের শেষে আশ্বিনের গোড়ায় ধানের ফসল তোলার পর সদ্য সন্তান প্রসব করা মা'কে বিশ্রাম দেওয়া হয় অরন্ধন ব্রত করে, যাকে চলতি ভাষায় বলা হয় রান্না পুজো – আগের রাত্রে নানাবিধ রেঁধে বেড়ে, ঠান্ডা উনুনের উপরে আর আশেপাশে মায়ের উদ্দেশ্যে কলাপাতায় সাজিয়ে রাখা হয় যাতে মা'কে উনুন তাতে না যেতে হয়।

তবে এখানে আরেকটা মজার তথ্য দেখা যাচ্ছে – পূর্ব বঙ্গের বাঙালীদের মধ্যে এই পুজো করা হয় সর্প মাতা মনসার উদ্দেশ্যে। হবেই তো – যে জল জঙ্গলের এলাকা সেটি, তাই বর্ষার শেষে সাপের ভয়ই বেশী। তাই পুজো করে মনসা মা'কে তুষ্ট রাখার চেষ্টা, যাতে তাঁর সন্তানেরা বেশী উৎপাত না করেন ! যে কারণেই দেবী পূজা হোক, আপনারা কি এর সাথে এদেশের Thanks giving এর সাদৃশ্য খুঁজে পাচ্ছেন ? তবে এগিয়ে যাওয়ার আগে বলে ফেলি যে কৃষিক্ষেত্রে উর্বরতা জাগিয়ে তোলার জন্য ওই শারীরিক মিলনের ব্যাপারটা কিন্তু দেখা যায় পৃথিবীর সব জায়গায়, এমনকি ইউরোপ, বা এই আমেরিকাতেও আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আমরা ভারতীয়রা আবার কোন প্রথাই একেবারে ছেড়ে না ফেলে নিজেদের মধ্যে মিশিয়ে নিই, তাই তার চিহ্ন থেকে যায়।

এই নিগ্রোবটুদের পরে যে আগন্তুকের দল বাংলায় আসে, নৃতত্ত্ববিদরা তাদের নাম দিয়েছেন আদি অস্ট্রেলীয় বা Proto Austroloid. নাম শুনেই বোঝা যায় যে এদের উৎপত্তি হয়েছে অস্ট্রেলীয়ায়, এবং আজকের বাঙালী সমাজের রীতিনীতিতে এই কোমটির প্রভাব সবচেয়ে বেশী। এরা আবার ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল বাংলাদেশেই নয় মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে এমন কি সিংহল পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। বেদে, বিষ্ণু পুরাণে, ভাগবত পুরাণে যে নিষাদদের বর্ণনা পাওয়া যায়, এরা মনে হয় সেই বংশধারার লোক। আমাদের বাংলায় বিশেষ করে রাঢ় অঞ্চলে যে সাঁওতাল, মুন্ডা, হো মালপাহাড়ী গোষ্ঠীদের দেখতে পাই, পন্ডিতদের মতে তারা এই আদি অস্ট্রেলীয়দের শাখা প্রশাখা। এরা বোধহয় ইন্দোচীন দ্বীপপুঞ্জ ঘুরে ৫০০০ বছর আগে বাংলায় এসে পৌঁছয়। এরা প্রথমে ছিল অরণ্যবাসী, গ্রাম বা শহর হতে দূরে গাছ পালার মাঝেই থাকতে পছন্দ করত। আজকের Australian aborigines দের জীবনের মাঝে এখনও এদের ঐতিহ্যের প্রত্যক্ষ ছাপ রয়েছে। তাদের দেখে আমরা অনুমান করি যে নিগ্রোবটুদের মতই প্রকৃতি নির্ভর জীবন ছিল এদেরও; কিন্তু চাষবাসের চেয়ে অরণ্যের গাছ পালা, পশুপাখী শিকার করেই এরা খাদ্য সংগ্রহ করত। এরা বাস্তবিক অর্থে প্রকৃতিপূজক, কারণ এদের ধারণা ছিল যে সৃষ্টিকর্তার স্বপ্নের থেকে গাছ পালা নদী পাহাড় আর জীব জন্তু জন্ম নিয়েছে, তাই এদের পূজার পীঠস্থান সেই সব গাছ, পালা নদী জলাশয়, যার মাঝে সেই সৃষ্টির শক্তি লুকিয়ে আছে। তারা বিশ্বাস করত যে তাদের গোষ্ঠীর কোন কোন বিশেষ সদস্য, আজকে যাদের আমরা গুণীন বলি, সেই শক্তি অনুভব করতে পারে আর রহস্যময় শব্দ বা গানে তাকে জাগিয়ে তুলতে পারে – এই গুণীন তাই এদের সব অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব করে, স্বপ্নের ওপারের সেই শক্তিকে গানে নাচে, গল্পে পূজায় জাগিয়ে তুলতো আধুনিক মানুষ একে জাদুশক্তি বা তুকতাক বলে, কিন্তু আমাদের নিজেদের পূজা আর্চায় এই বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান ছাপ ফেলে গেছে। বলেছি যে এরা খাবার জোগাড় করতো গাছের ফলমূলে আর শিকার করে। এখনো এরা শিকার করে, কিন্তু অকারণে প্রাণী হত্যা এদের জন্য নিষিদ্ধ, কারণ মাতা অরণ্যপ্রকৃতির কোন রকম ক্ষতি এরা করেনা বা করত না – আজকে আমরা যাদের environmentalist বলি, এরা ছিল তার প্রথম সংস্করণ। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বা অবাক করা ব্যাপার যে এদের ধারণার মধ্যে আমাদের হিন্দু ধর্মের জন্মান্তরবাদের বীজ খুঁজে পাওয়া যায়। এদের বিশ্বাস যে সৃষ্টিকর্তার স্বপ্নের থেকে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী জন্মায় আবার মৃত্যুর পর সেই স্বপ্নের ভিতর ফিরে যায়; আবার সেই স্বপ্নের থেকেই মাটিতে নেমে আসে। মৃত্যুর পর মৃতদেহ দাহ করাটাও ছিল এদের সৎকার প্রথা, যা আজও আমরা অনুসরণ করে থাকি। আর এই যে আমরা নানা গাছের মূলে নানা দেবী বা দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা দিই, সিঁদুর মাখাই, বাঁকুড়ার মাটির ঘোড়া বা অন্যান্য পুতুল দেবতার উদ্দেশ্যে রেখে আসি, সবই সেই আদি অস্ট্রেলীয়দের প্রকৃতি প্রেমের আর জাদু বিশ্বাসের উত্তরাধিকার। এরই থেকে আমাদের গাঁয়ে গাঁয়ে নদীর ধারে কত দেবী মায়ের থান। যেহেতু প্রকৃতি মানুষের মা, তাই সেই সব থানে বেশীর ভাগই নানান নামে সেই মায়ের পূজা হয়। কখনো তিনি বনবিবি হয়ে সুন্দর বনের গভীর জঙ্গলে বাঘের রাজা দক্ষিণ রায়ের হাত হতে মানুষকে বাঁচান, কখনো ওলাওঠো বা বসন্ত রোগ হতে ওলা বিবি বা শীতল দেবী হয়ে আমাদের রক্ষা করেন।

এই সব গোষ্ঠী যতদূর মনে হয় হিন্দুকুশ পাহাড়ের বোলান পাস দিয়ে অথবা জলপথে ভারতে আসে। এছাড়া আরেকদল জনগোষ্ঠী বা কৌমও ওই পথ দিয়েই বাংলায় আসে ইউরাল পর্বতের কিনার থেকে। আমরা যাদের ইন্দো ইউরোপীয় বলি, এরা সেই গোষ্ঠীর লোক, কিন্তু এরা অন্য ইন্দো ইউরোপীয় মানে বৈদিক আর্যদের ভাষা ব্যবহার করত বলে মনে হয় না – এদের বলা হয় অ্যালপিনীয়। এরা বাংলার সংস্কৃতিতে এমন মিশে গিয়েছে যে সহজে এদের রক্তধারা বা

বৈশিষ্ট্য নজরে পড়েনা, তবু এদের অবদান আমাদের ব্রত পূজায় প্রভাব ফেলেছে। সবশেষে যাদের কথা বলতে হয়, তারা এসেছিল আগের গোষ্ঠীদের উল্টো দিক হতে অন্য পথ ধরে – এরা ছিল দক্ষিণ পূর্ব চীনের অধিবাসী – হিমালয় বেয়ে তারা আমাদের বাংলায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এদের বলেন ভোট চীনীয় গোষ্ঠী। পূরাণে মহাকাব্যে এদের বলা হয়েছে কিরাত; আজকের যুগে মণিপুরী, চাকমা জাতীয় লোকেরা এদের রক্তধারা ও সংস্কৃতি বহন করে নিয়ে চলেছেন। এই গোষ্ঠীটি ছিল শিকারী ব্যাধ। মহাভারতে অর্জুন যখন পাশুপত অস্ত্রের জন্য শিবের আরাধনা করতে বসেন, তখন শিব ও দুর্গা এই কিরাত ও কিরাতিনী রূপে তাঁর সাথে ছদ্মকল। করেছিলেন – গল্পটি মনে না থাকলে আরেকবার মহাভারতটি খুলে পড়ে ফেলুন। ভারী মজার গল্প সেটি। তবে গল্পটি পড়লে বোঝা যায় যে শিব ঠাকুরের কল্পনা এই সব অনার্য শিকারী গোষ্ঠীদের থেকেই নেওয়া হয়েছে।

তাহলে দেখা গেল যে প্রথম যে সব গোষ্ঠী এই বাংলার বুকে এসে বাসা বেঁধেছিল, প্রকৃতির সাথে তারা গভীরভাবে একাত্ম ছিল। সেই জন্যই আমাদের পূজা অর্চনা, দেবতার ধারণা সবই সেই প্রকৃতিকে ঘিরে, যে প্রকৃতি মা হয়ে আমাদের খাদ্য যোগায়, যার কোলে আমরা বাস করি। চলুন তাহলে এবার গল্প করি আমাদের বাঙালীদের জীবনে যেটি প্রধান উৎসব শরৎ কালের দুর্গা পূজা নিয়ে। চাষবাস অবশ্য আমরা শহুরেরা তেমন জানি না, তবু বলি যে কখনো কি ভেবে দেখেছেন যে আমরা ভেতো বাঙালীরা, মানে দুটি ভাত নাহলে যাদের চলে না, তারা দুর্গা পূজাটা ঐ ধান তোলার শেষেই করি। জানেন তো নিশ্চয় যে এই বাংলায় শরৎ ঋতু আর বসন্ত ঋতুতে ধান চাষ হয়। আমন হয় শরৎ কালে আর বসন্ত কালে হয় আউশ ধান। এই দুই রকমের ধান তোলার সময়েই বাংলার বুকে দুর্গা পূজার ঢাক বাজে। মনে করে দেখুন যে শরৎ কালের পূজা যেটিকে আমরা বলি অকাল বোধন, সেটি হলো আমন ধান তোলার সময়। আবার মার্কন্ডেয় পূরাণের চন্ডীতে যে গল্প পাই, তাতে বলা হয় যে প্রথম দুর্গা পূজা, যা রাজা সুরথ করেছিলেন, সেটি হয় বসন্ত কালে, অর্থাৎ কিনা আমরা যাকে বলি বাসন্তী পূজা, সেটি হয় আউশ ধান তোলার মরশুমে। তাহলে দাঁড়াল এই যে দুর্গা পূজা হল সেই আদিকালের মানুষদের শস্য উৎসব। আপনি হয়তো ভাবছেন যে আমি বাজে বকছি, কারণ কোথায় কুমোরটুলির গড়া তেজে ঝলমল মায়ের রূপ, আর কোথায় শস্য দেবী! আচ্ছা মন্ডপের একপাশ দিয়ে দাঁড় করানো কলা বৌ – তাকে মনে আছে তো, মানে সেই নবপত্রিকাটি, যাকে ষষ্ঠী পুজোর দিন ভোর বেলা মহা সমারোহে স্নান করিয়ে এনে গণেশ দাদার পাশে লালপাড় শাড়ীতে ঘোমটা দিয়ে দাঁড় করানো হয়? শুধু কি ঘোমটা, তাঁকে সিঁদুর পর্যন্তপরানো হয়। আমরা ভাবি আহা এমন গোলগাল মায়ের খোকা, হাতীমুখ বলে তার বৌ জোটেনি গো, তাই মা ওই খোকাকে গাছের সাথে বিয়ে দিয়েছেন। আসলে কিন্তু ওই নবপত্রিকাটিই শরৎ কালে প্রাণের উর্বরতায় সত্যিকারের মা দুর্গার প্রতীক। লালপাড় শাড়ীর ঘোমটাটিতে কেবল কলা গাছ থাকে না, থাকে হলুদ সুতোয় বাঁধা আলাদা আলাদা নয়টি গাছের ডাল কলা, কচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক ধান, মানকচু। ষষ্ঠীর ভোরে সেই কলা বৌকে যদিও পুকুর ঘাটে বা কলসিতে রাখা গঙ্গাজলে মেশানো জলে নাওয়ানো হয়; তবে নিয়ম কিন্তু আলাদা আলাদা ঘটে রাখা আলাদা আলাদা নদীর জলে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় রাগ রাগিনী শুনিয়ে স্নান করানোর। প্রথম ঘটে থাকে গঙ্গাজল, সাথে বাজবে মালব রাগ, পরবর্তীতে ললিত রাগ বাজিয়ে বৃষ্টির জলে স্নান, তার পর সরস্বতী নদীর জল ঢালা হবে, তখন বিভাস রাগে বাজবে দুন্দুভি, এর পরে ঘট হতে সমুদ্রের জল ঢালার সময় ভৈরবী রাগে ভীম বাদ্য বাজানো হবে, এর পরে পঞ্চম ঘট হতে তীর্থের জল ঢালার পালা সাথে বাজবে গৌরমল্লার রাগ, ষষ্ঠ ঘটে ঝর্ণার জলে যখন নবপত্রিকা স্নান করবেন, তখন বরাড়ি রাগ বাজবে আর বাজবে শঙ্খ বাদ্য। বুঝতেই পারছেন যে সেই আদিম অধিবাসীদের বিশ্বাস মেনে নিয়েই গানে বাজনায় তুষ্ট করে সব রকমের গাছ, নানা নদীর জলে স্নান করিয়ে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। নবপত্রিকাই তাই শস্যরূপিণী মাতা, যাকে চন্ডীতে শাকম্ভরী বলা হয়েছে। এখন দশহাতে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ভয়ঙ্কর অসুরকে মেরে ফেলা আমাদের সুন্দরী মা দুর্গার জায়গায় নবপত্রিকাকে কল্পনা করাটা কঠিন হলেও সেই সহস্র সহস্র বছর আগের কৃষিজীবী আদিম সমাজের বিশ্বাসের প্রতীক নবপত্রিকা আজ ও দুর্গা পূজার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এককালে প্রতিমা পূজা না করে ওই নবপত্রিকাকেই দুর্গারূপে পূজা করা হত; এমন কি এখনও অনেক জায়গায় সেই প্রথা রয়েছে। খেয়াল করে দেখবেন যে প্রতিমা ভাসানের সময়ে যখন দুর্গা মাঈ কী জয় বলে মাটির প্রতিমা জলে ভাসালেন, তখন নবপত্রিকাকে আগে বিসর্জন

দেওয়া হয়। চন্ডীতে দুর্গাকে লক্ষ্মী নামেও অভিহিত করা হয়েছে – তাই এই শস্যরূপিণী মাতার পূজার জন্যই লক্ষ্মী পূজার দিনও অনেক জায়গায় নবপত্রিকা প্রতিষ্ঠা করা হয়। কোনও কোনও পরিবারে কলা গাছের বাকল দিয়ে নৌকা বানিয়ে তাতে ধান ভরে দেওয়া হয়। বৃক্ষ লতা, শস্যের মাঝে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করার আরও চিহ্ন খুঁজে পাবেন। পূজার অঞ্জলি দেওয়ার সময় যদিও দেবীর রূপ ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করে দেবীর চরণে ফুল ছুঁড়ি, এইটা দেখতেই পাই যে মূল অর্চনা হয় সামনের পূর্ণ ঘটটির উপর – ঘট তুলে ফেলা মানেই পূজা শেষ। সেই ঘট যখন পাতা হয়, তখন প্রথমে কিছু ধান ছড়িয়ে দিয়ে তার উপর ঘট বসানোর প্রথা নিশ্চয় মনে আছে ? আর এটাও নিশ্চয় মনে আছে যে ঘটের উপর থাকে আমগাছের সবুজ পল্লব আর সশীর্ষ ডাব। সবই সেই আদি মাতা ধরিত্রীর সন্তানের প্রতিভূ। মহিলারা নিশ্চয় ছোটবেলা থেকেই দেখেছেন যে ঘটটি বসাবার সময় গিন্নী বান্নীরা তার উপর সিঁদুর দিয়ে একটি মাঙ্গল্য চিহ্ন আঁকেন, তবে সেটি যে মা ষষ্ঠীর প্রতীক, তা বোধহয় সকলে শোনেননি। এখন ষষ্ঠী হলেন মায়েদের কোলে ছেলেপুলে দেওয়ার ও তাদের রক্ষা করার দেবী, অর্থাৎ কিনা প্রজনন শক্তির অধীশ্বরী। একটু মন দিয়ে লক্ষ্য করলেই বুঝবেন যে তাঁর যে চিহ্ন আঁকা হয়, সেটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার মুহূর্তে উবু হয়ে বসা একটি জননীর ছবি। আপনাদের মাঝে যাঁরা আধুনিক, তাঁরা হয়তো এইবারে আমাকে 'রে, রে' করে তেড়ে আসবেন – পুজোর মত পবিত্র ব্যাপার নিয়েও আবার কি অসভ্যতা! প্রাচীনারাও রাগ করতেই পারেন, কারণ কে না জানে সন্তান জন্মের পরে মায়ের অশৌচ লাগে, মানে লাগত। তাহলে পূজার শুদ্ধাচারে কি করে ওসব আঁকা হবে ? কিন্তু আমি নিরপরাধ। বড় বড় পন্ডিতেরা এই মত পোষণ করছেন বলে দেখতে পাচ্ছি। শুধু কি আমাদের বাংলা দেশে ? হরপ্পা, মহেঞ্জোদড়োতেও দুটি মাতৃমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেখানে মাতার জন্মদানের ছবি অবশ্য নয়, তবে তিনি বরাহমুখী ও দুটি সন্তানকে দুটি বাহুর ভাঁজে নিয়ে তিনি তাদের স্তন্য পান করাচ্ছেন। আবার ভূমধ্যসাগরের দ্বীপ সুদূর ক্রীটেও সন্তান বক্ষে মাতৃমূর্তি দেখা যায়। সেখানে আবার মা ষষ্ঠীর বেড়ালটি তাঁর মাথার উপর বসে আছে। প্রকৃতি ও মানুষের এক মাতৃশক্তিতে বাঁধা থাকার এটি নিদর্শন। মাতার জন্মদানের মোটিফটি ভারতবর্ষের সীমা ছাড়িয়ে চীন, মিশর – নানা জায়গায় দেখা যায়, মানে যেখানে যেখানে কৃষিজীবী আদিমতম অধিবাসীদের মাঝে এই প্রকৃতিপূজার প্রচলন ছিল, সেই সব জায়গায় আর কি।

এইখানে কেউ নিশ্চয় বলবেন যে, "সে তো বেশ বলেছো" – ফসল তোলার সময় প্রজনন শক্তিকে মাতৃ মূর্তি হিসাবে মা দুর্গার পুজো হয়। কিন্তু সেই ঋতুতেই তো আরেকটি মাতৃ মূর্তির পুজো হয়, যাঁকে দেখে ভয়ঙ্করী মনে হয়। বুঝতেই পারছেন যে কালী মূর্তির কথা বলছি।

তবে সে তো হল – এদিকে যে আরেক গোল বাধল। নবপত্রিকাই যদি দেবী হন, তাহলে তো তিনি গণেশের মা কিন্তু তবে তাঁকে গণেশের বৌ ভাবা হল কি করে ? এই ব্যাপারে খোঁজ খবর করতে গিয়ে আরেকটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাচ্ছি। গণেশের ওই যে গোলগাল হাতিমুখ মূর্তিটি আমরা দেখে আসছি, ওই চেহারায় তাঁর পুজো বা কল্পনা নাকি সেই হাজার হাজার বছর আগে, মানে যখন প্রকৃতিকে মাতৃ রূপে পূজা শুরু হয়, সেই সময়ে শুরুই হয়নি। দার্শনিক ঐতিহাসিক আনন্দ কুমারস্বামী দেখি বলছেন যে গুপ্ত যুগের আগে মানে চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝের যে সময়টাকে ভারতের ইতিহাসের মধ্য যুগ বলা হয়, তার আগে এই চেহারায় গণেশের পূজার কথা জানা যাচ্ছে না। কিন্তু গণেশকে যে পূজা করা হত, তা তো ঠিক। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (যেটি নাকি ৪র্থ থেকে ৬ষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দের রচনা) গণপতির উল্লেখ রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। দুটি সময়ের মধ্যে প্রায় হাজার বছরের ফারাক ! তাহলে ?? ওদিকে আবার এর পরের উপনিষদ গুলিতে এবং মহাভারতের মত মহাকাব্যেও বারবার নানা নামে গণেশের উল্লেখ রয়েছে – তাকে কোথাও বলা হচ্ছে বিঘ্ননাশক অর্থাৎ বিপদ দূর করে দেওয়ার দেবতা, কোথাও বা বিনায়ক (বাধা বিনাশন) এবং আরো কত কি! এই নিয়ে বিদ্বানদের মধ্যে এতরকম কথা বার্তা, তা বুঝতে গিয়ে আমারি মাথা ঘুরছে, তা আপনাদের বোঝাবো কি ? যা বুঝলাম, তা হলো যে প্রত্যেকটি নামের পিছনে বিভিন্ন যুগে যে সব কোম বা গোষ্ঠী এসেছে, তাদের ইতিহাস জড়ানো রয়েছে। যেটুকু বুঝলাম যে গণেশ হলেন গণ + ঈশ। তিনি তাহলে গণের অধিপতি। "গণ" মানে যে গোষ্ঠী, এ তো আপনারা সবাই জানেন। তা সেই আদি যুগে যখন বিভিন্ন গোষ্ঠী মিলেমিশে যাচ্ছিল, তখন এক একটি গোষ্ঠীর যারা নেতা, তাদের বলা হত গণপতি। তার অর্থ তখন মোটে একটি গণেশ নয়, অনেক গণেশ বা গণপতি ছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা আদতে নাকি তাঁরা মোটেই বিঘ্ন নাশক ছিলেন না, বরং

ছিলেন গোলমাল বাঁধাতেই ওস্তাদ, মানে বেশ গুন্ডা বা 'দাদাগিরি' করা লোক। তা হবেই তো – নিজের নিজের দল বা গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করতে যাওয়াটা তো ভালমানুষ হলে চলবে না, তাই তাঁদেরকে সোজাসুজি বিঘ্নেশ্বর অর্থাৎ কিনা গোলমালের পাণ্ডা বলা হত। বুঝলেন তো কেন আজও গণেশকে বলা হয় ক্রোধী দেবতা – রাগলে তিনি তাঁর বাবা শিবঠাকুরের মত কারুর রক্ষে রাখেন না। যাই হোক, প্রথম দিকের সেই গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের সময়ে অনেক গণেশের তাঁদের হস্তক্ষেপে মানে তাঁদের সালিশীতে যখন দেখা গেল যে সব দলাদলি, গোলমাল মিটে গিয়ে বেশ শান্তি ফিরে আসছে, তখন তাঁদের নাম হল বিঘ্নবিনাশন বা বিনায়ক, যদিও বিঘ্নেশ্বর গল্প নামটিও রয়েই গেল। এতসবের পর সমাজ যখন মিলে মিশে এক হল, তখন গণেশ রইলেন একটিই। তবে মুশকিল হল যে এই নানান গণেশের নানা জীবনবৃত্তান্তগুলি পুরাণে বা লোকের মুখে মুখে রয়েই গেল। যেমন দেখুন মহাভারতের মতো একটিই মহাকাব্যে একাধিক গল্প রূপকের ছাঁদে লেখা মানে রেকর্ডেড হয়ে রয়েছে। উত্তর পশ্চিম ভারতে বলা হল যে শিবঠাকুরের তপস্যা করতে যাওয়ার পর পার্বতী একা থাকতে না পেরে স্নানে যাওয়ার আগে নিজের রূপটান দিয়ে একটি খোকা বানিয়ে দরজায় পাহারা দিতে রেখে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে শিবঠাকুর ঘরে ফিরে এলে সে খোকা আবার তাঁকে চিনতে না পেরে ঘরে ঢুকতে দেবে না। রাগের চোটে শিবঠাকুর তার সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে তার মাথাটি কেটে ফেলেন। ওধারে পার্বতী স্নান সেরে ফিরে এসে খোকার কাটা মুন্ড দেখে কান্না জুড়লেন। শিব তখন বউয়ের কান্না থামাতে নন্দীকে একটি মাথা আনতে পাঠিয়ে দিলেন এবং সে আর কোথাও কিছু না পেয়ে ইন্দ্রের ঐরাবতের মাথাটি কেটে এনে হাজির করল এবং খোকার মাথায় সেটি জুড়ে দেওয়া হল। আবার আমাদের বাংলাদেশে যে গল্পটি সবচেয়ে বেশী প্রচলিত, সেটি ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ হতে নেওয়া। সেটিতে বিষ্ণুর আশীর্বাদে শিব পার্বতীর একটি চমৎকার খোকা হল; পার্বতী খোকা দেখতে সব দেবতাদের নেমন্তন্ন করলেন। কিন্তু শনি ঠাকুর তো জানতেন নেমন্তন্নে আসতে দোনামনা করছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে তপস্যা করতে গিয়ে নিজের স্ত্রীটিকে অবহেলা করে স্ত্রী তাঁকে এক ভয়ঙ্কর রকম শাপ দিয়ে বসে আছেন – যার ফলে তাঁর চোখ যার উপর পড়ে, সে ছারখার হয়ে যায়। কিন্তু পার্বতীও খোকাকে দেখাবেন বলে নাছোড়বান্দা। অতএব শনিকে খোকাকে দেখতে আসতেই হল আর যা ভয় পাওয়া গিয়েছিল, একেবারে তাই – খোকাটির মাথা তাঁর নজরে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এর পরে হাতীর মাথা খোকার শরীরে জুড়ে দেওয়ার ব্যাপার সেই আগের গল্পটির মতই। যাই হোক, দেখা যাচ্ছে যে সবগুলি গল্পেই পার্বতী বা দেবী হলেন গণেশের মা। তা সেই মা কি করে কালের ফেরে নিজের ছেলেরই বৌ হিসাবে পূজা পাচ্ছেন, সেটি ভাবার বিষয়। অবশ্য বলে নেওয়া ভাল যে এইরকম পুজোর প্রথা কেবল আমাদের বাংলা দেশে দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতে গণেশকে চিরকুমার ব্রহ্মচারী বলা হয়; আর উত্তর পূর্ব ভারতে বলা হয় যে গণেশের দুটি স্ত্রী – রিদ্ধি, সিদ্ধি। ঋদ্ধি হলেন সম্পদ ও সমৃদ্ধির রূপক আর সিদ্ধি হলেন বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার রূপক। ভেবে দেখতে গেলে গোষ্ঠীপতি হয়ে দলাদলির সমাধান করে সকলের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিলিব্যবস্থা করার জন্য ওমনি দুটি গুণবতী স্ত্রী থাকা প্রয়োজন বৈকি ! তবে সে যাই হোক, অন্যখানে কিন্তু দেবী পূজার সময় গণেশকে সস্ত্রীক পূজা করার নিয়ম নেই। কিন্তু এতে তো আমাদের প্রশ্নের সুরাহা হল না। মাতা পুত্রের সম্বন্ধটা ঘুলিয়ে ফেলার কারণটা কেউ খুলে বলছেন বলে দেখছি না। তবে অনুমান করছি যে এর সম্পর্ক সেই কৃষি জমির উর্ব্বরতা ও প্রজনন শক্তির সাথে রয়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা তো বলেন, যে জমিতে ফসল ফলিয়ে খাদ্য উৎপাদন মানে কৃষিকাজ প্রথম আরম্ভ করেন মেয়েরা ; সেই কারণে প্রথম সমাজও ছিল মাতৃতান্ত্রিক – মায়ের পরিচয়েই শিশু পরিচয় পেতো। শস্য শ্যামল বাংলার জমিতে কৃষি কাজে সাফল্য পেতে হয়তো সে জন্যই হয়তো গোষ্ঠীপতি গণেশের পাশে উর্ব্বরা শক্তি দেবীর প্রতিভূ হিসাবে নবপত্রিকা স্থান পেয়েছেন। এই যে গণেশকে আমরা দেখি লাল টকটকে সিঁদুর মাখা চেহারা, সেটিও নাকি নারী মানে মাতৃ শক্তির সহচর হওয়ার দরুন। বিদ্বানেরা আন্দাজ করছেন যে এই মাতৃতান্ত্রিক সমাজই গণপতিকে নারীর ব্যবহারের সিঁদুর মাখানো আরম্ভ করা হয়েছিল। যাক, এ তো হল শাস্ত্রের মতে গণেশ ঠাকুরের জন্ম ও বিবাহ বৃত্তান্ত, কিন্তু আমাদের বাংলায় কিন্তু তিনি তেমন ধুমধাম করে পুজো এই সেদিন পর্যন্ত পেতেন না। তাঁকে পুজো অবশ্য ঠিকই করা হত, কারণ প্রথমে তাঁকে পুজো না করে নিলে সকল কাজই পন্ড, তিনিই সিদ্ধিদাতা কিনা – আসলে তো গোষ্ঠী প্রমুখ দাদা গোছের ঠাকুর তিনি চিরকাল । তাছাড়া তাঁর নিজের মা, বাবা – শিব আর পার্বতীর প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তির জন্য তাঁদের কাছ হতে সে ধরণের বরও পেয়েছেন। নতুন বছরে ব্যবসায়ীরা হালখাতা পাল্টানোর সময়, তাঁকে পেন্নাম ঠুকে খাতাটি খুলত।

দোকানে দোকানে উচুঁ তাকে কিংবা ক্যাশ বাক্সের পাশে তাঁর মূর্তি সাজানো থাকত; দোকান খোলার সময় দোকানী ধুপ জ্বেলে হাত জোড় করে কাজ কারবার শুরু করত। এসব ছাড়া তাঁকে নিয়ে বিশেষ হৈ চৈ হত না। মোটামুটি তিনি ওই দুর্গা পূজার সময়ে মায়ের সাথে চুপটি করে বসে থাকতেন। তাঁর আসল পপুলারিটি ছিল মুম্বাই এলাকায়। শোনা যায় যে ১৮৯৪ সালে মুসলমানদের মুহরমের ঘটাপটার মোকাবিলা করতে বাল গঙ্গাধর তিলক সেখানে তাঁর জন্মদিন ভাদ্র মাসের চতুর্থীতে মানে গণেশ চতুর্থী পালন করা শুরু করেন, অর্থাৎ কিনা গোষ্ঠীপতি গণেশ দাদার স্বাধীনতা আন্দোলনেও একটি ভূমিকা ছিল। হবেই তো গোষ্ঠীপতি বলে কথা। হাল আমলের বলিউডি জমানায় আরব সাগরের পার থেকে সে পূজা বঙ্গোপসাগরের পারে পাড়ি দিয়ে এসেছে – এখন আমরাও মহা সমারোহে মাইক বাজিয়ে গণেশ চতুর্থী করে থাকি। সত্যি মিথ্যে জানিনা, শুনি মহানায়ক উত্তম কুমার নাকি মুম্বাইতে ফিল্ম করতে গিয়ে এ পূজা নিজের বাড়ীতে শুরু করেন। সেটা সবটাই অবশ্য বিশুদ্ধ গুজব হতে পারে। তবে বাংলায় গণেশ চতুর্থী পালিত হয় হেমন্ত ঋতু চতুর্থীতে। মোটের উপর গণেশ দাদা মুম্বাই থেকে আমাদের বাংলায় এসে দুই খানি জন্মদিন পেয়েছেন।

এতক্ষণ ধরে তো কেবল গণেশের কথাই হল, এবার তাহলে তাঁর ভাই কার্তিকের গল্পটাও করেই ফেলি আমরা, যদিও বাংলায় কার্তিক পূজাটা তেমন প্রচলিত নয়, তিনি হলেন দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় ঠাকুর। সেখানে মুরুগা বা স্কন্দ, বা সুব্রহ্মণ্যম নামে তাঁর ভারী নাম ডাক। তাঁকে সেখানে যুদ্ধের দেবতা তারকাসুরদমন বলে পূজা করা হয়। ওই তারকাসুর আর তার সাথে সুরাপদ্ম আর সিংহমুখ নাম আরো দুটো অসুর তপস্যা টপস্যা করে শিবঠাকুরকে সন্তুষ্ট করে প্রায় অমর হয়ে গিয়ে স্বর্গ মর্ত সবখানে সকলকে জ্বালিয়ে মারছিল। শিব যে হামেশাই এমনি বেখেয়ালী কান্ড করে থাকতেন সে তো সবাই জানি। কিন্তু তারপর এই দুষ্টু অসুরগুলোকে সামাল দেয় কে ? দেবতারা তখন এসে শিবেরই কাছে কেঁদে পড়ায়, তিনি দুষ্টু অসুরদের শাস্তি দেওয়ার জন্য একটি তেজস্বী পুত্রের জন্ম দেবেন ঠিক করলেন আর সেই উদ্দেশ্যে পার্বতীর সাথে মিলিত হলেন। কিন্তু শিবের তেজ তো – তাই সে মিলনে সৃষ্টি হল পুত্র নয়, ছয়টি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের। পার্বতী সে তেজ ধারণ করা দূরে থাকে, সেটিকে সহ্য করতে না পেরে অগ্নিতে ছুঁড়ে ফেলেন। সে স্ফুলিঙ্গের এমনি তেজ স্বয়ং অগ্নিও অস্থির হয়ে দিলেন সে গুলিকে গঙ্গায় ফেলে – বেচারী গঙ্গা তাদের ভাসিয়ে নিতে নিতে নিজের জলই প্রায় শুকিয়ে ওঠার দাখিল। অতএব তিনিও হাত বদল করে ফেললেন। সে ছটি স্ফুলিঙ্গকে নিয়ে গিয়ে তুলে দিলেন ছয় কৃত্তিকার কোলে। কৃত্তিকারা হলেন গিয়ে নীহারিকা পুঞ্জের জ্বলন্ত তারা; তাই সেই স্ফুলিঙ্গ কটিকে মানুষ করা তাঁদের কাছে কঠিন হল না। বেশ কয়েক মাস foster parenting করে ছয়টিকে বড় সড় খোকা করে নিয়ে তাঁরা তাদের আসল বাপ আর মা মানে শিব পার্বতীর কোলে তুলে দিয়ে এলেন। একসঙ্গে ছ'ছয়টি খোকা এসে উপস্থিত হওয়ায় কোন মায়ের না অসুবিধা হয়? পার্বতীরও হয়েছিল নির্ঘাত, কারণ গল্পের এইখানে এসে দেখছি শিবঠাকুর ছয়টিকে এক করে চমৎকার একটিই খোকা বানিয়ে দিলেন। কৃত্তিকাদের কোলে মানুষ, তাই তার নাম হল কার্তিক, আবার গোড়ায় ছয়টি মুখ ছিল তাই তাকে ষড়াননও বলা হল। এখন গণেশ আর কার্তিক এদের মাঝে কোনটি বাপ মায়ের বড় খোকা আর কোনটি ছোট খোকা, এ নিয়ে পন্ডিত মানুষেরা বিস্তর আলোচনা করেছেন। আমরা এত কচ্‌কচির মাঝে না ঢুকে একটু এগিয়ে যাই বরং। বাংলায় কার্তিক ঠাকুরের পূজা হয় লক্ষী পূজার পর আর জগদ্ধাত্রী পূজার আগে, তবে তার কয়েকদিন আগেই দুর্গা পূজার সময় ফুলবাবু সেজে মায়ের পাশটি দিয়ে ময়ূরে চেপে তিনি বসে থাকেন, সে তো সবাই বরাবর দেখছি। চেহারাটিও সুন্দর তাই সুন্দর পুরুষ মানুষের উপমাই হল "কার্তিকের মত চেহারা।" কিন্তু দু'দুবার পূজা পেতে মানে একবার মায়ের সঙ্গে আবার কয়েক দিনের মধ্যে নিজে পূজা নিতে উপস্থিত হওয়ার জন্য তাঁর বাংলা দেশে একটু সম্মানের ঘাটতি হয়ে পড়েছে – চলতি ভাষায় তাঁর নাম হয়ে গিয়েছে "হ্যাংলা কার্তিক"। তাছাড়া বাঙালী তাঁর বিয়ে হয়েছে – এটাও মানে না, বলে তিনি নাকি চিরকুমার। দক্ষিণ ভারতে অবশ্য তাঁকে দেব সেনাপতি হিসাবে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করা হয়, এবং ইন্দ্রের মেয়ে দেবসেনার সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছে বলেও জানা যায়। বাঙালীর কাছে তিনি কোথাও খোকা কার্তিক, কোথাও জামাই কার্তিক আবার কোথাও বা রাজা কার্তিক। বাংলায় তাঁর সন্তান রূপেরই পুজো হয়। এক্ষেত্রে আরও একটা প্রচলিত নিয়ম হল কার্তিক ফেলা। সাধারণত নববিবাহিত দম্পতির বাড়ীতে তাঁদের সন্তান লাভের কামনায় বন্ধু স্থানীয় কেউ না জানিয়ে বাড়ির সামনে কার্তিক বিগ্রহ রেখে যান। তারপর সেই

বিগ্রহ বাড়িতে এনে পুজো করতে হয়, এবং একবার কার্তিক পুজো করলে, অন্তত তিনবছর সেই পুজো চালাতে হয়। প্রশ্ন হল যে তাহলে কি কার্তিক দক্ষিণ ভারত থেকে বাংলায় এসেছেন, তিনি কি অনার্য জনজাতির অবৈদিক দেবতা ? কিন্তু ঋগ্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণে কুমার বলে একটি দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়, যিনি দেবী ঊষার পুত্র। ছান্দোগ্য উপনিষদেও স্কন্দের উল্লেখ রয়েছে, তবে তাঁর সাথে স্কন্দপুরাণে যে স্কন্দের কথা শুনছি, তারা এক বলে মনে হচ্ছে না। তার মানে কার্তিক হয়তো পৌরাণিক দেবতা, মানে বেদের রচনা কালে বই, তার পরে পুরাণ রচনার সময়ে তাঁকে দেবতাদের সারিতে তুলে নেওয়া হয়েছে।

ওই যাহ, এত এত ঠাকুর দেবতার খোঁজ খবর করতে গিয়ে দেখি পুরাণ আর পৌরাণিক কথাটি নিয়ে আড্ডায় আগে আলোচনায় করা হয়নি। পুরাণ গ্রন্থগুলো হিন্দু ধর্মের আকর গ্রন্থের মধ্যেই ধরা হয় বটে, কিন্তু সেগুলি বেদ উপনিষদের অঙ্গ নয়। বেদ ও উপনিষদের অনেক পরে তাদের রচনা হয়েছে। হিন্দু ধর্মের দেবী দেবতাদের উৎপত্তি, লোকবিশ্বাস, নীতি নিয়ম, ঐতিহাসিক কাহিনী, লোককথা, জ্যোতিষ রহস্য, চিকিৎসা শাস্ত্র, এমন কি কুসংস্কার ও জাদু বিদ্যা – কি না নিয়ে সে সব পুরাণ রচিত হয়েছে! তবে সেগুলিকে আবার বাস্তব ইতিহাস ভেবে বসবেন না যেন – সে সব গল্প বেশীর ভাগ সময়েই বাস্তব তথ্যের সাথে কিছু কল্পনার মিশেল দেওয়া রূপক কাহিনী, কখনো বা তাতে থাকে পুরাণ রচয়িতাদের নানাবিধ দার্শনিক ভাবনার বিস্তার। তারা কখনই বাস্তব নয়। এর রচয়িতাদেরা নাম অবশ্য কোন কোন ঋষি বা মুনি বলা হয়। সে সব নাম শুনলে মনে হয় যে এসব সেই আর্য ঋষিদেরই লেখা, কিন্তু এদের রচনাকাল ও বিবরণ স্পষ্ট বলে দেয় যে এইসব পুরাণে যে কথা বলা হয়েছে, সে সময় নাগাদ সকল জনজাতি ও হয়তো বা আর্য গোষ্ঠী মিলে গিয়ে একটি সমাজ গড়ে উঠেছিল এবং তাই পুরাণে বর্ণিত দেবতারা অনেকেই সেই নানা জনজাতির তৎকালীন ইতিহাস ও ভাবনা থেকে এসব গল্পের নায়ক হয়ে উঠেছেন।

যাই হোক, ভাইদের নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছি আমরা এতক্ষণ এবার তাদের সাথে মায়ের পাশে যে দুটি বোন দাঁড়িয়ে থাকেন তাঁদের কথাও হয়ে যাক। প্রথমে সে বোনটির কথাই বলি, যাঁর সঙ্গে আমাদের চেনাশোনা আমাদের সবচেয়ে বেশী। প্রতি বৃহস্পতিবার তাঁর পুজো করাটা বেশীর ভাগ বাঙালী বাড়ীতেই তো অবশ্য কর্তব্য, মানে এককালে তাই ছিল। আজকাল অবশ্য ঘরের লক্ষ্মীরা নানান কাজে ব্যস্ত থাকেন, তাই বেস্পতিবারটা অনেকের সময়ে সময়েই বাদ পড়ছে। তাহলে কি হবে – দুর্গা পূজার পর শরৎ পূর্ণিমার দিন সকল ঘরের মা লক্ষ্মীরাই প্রায় এঁর ব্রত করেন। দল বেঁধে শাড়ী শাঁখা সিঁদুর পরে আল্পনা দিয়ে নাড়ু মোয়ার নৈবেদ্য সাজিয়ে পাঁচালী পড়ে সে ব্রত প্রায় এক গণউৎসব। যাই হোক কথা হল এই পপুলার দেবীটি আমাদের কাছে এলেন কোথা হতে ? বেদ উপনিষদ খুঁজে দেখি যে সেখানে "শ্রী" শব্দটির উল্লেখ রয়েছে, তবে লক্ষ্মী নামটি পাওয়া যাচ্ছে না। তবে শ্রী যে পরে লক্ষ্মীর আরেকটি নাম হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা শুনেছি। তা ঋগ্বেদ আর তৈত্তিরীয় সংহিতায় রূপ আর ঐশ্বর্য্য অর্থে "শ্রী" কথাটি বলা হচ্ছে কিন্তু সে সব শাস্ত্রের লেখকেরা, মানে আর্য্যেরা "শ্রী"কে দেবী বলে উল্লেখ করেননি। এটার কারণ কি ? প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে আর্যরা প্রথমে ছিলেন পশুপালক। তাঁরা ভারতের লোক ছিলেন না নাকি ককেশীয় পর্বতমালার কাছ হতে এদেশে এসেছিলেন, এসব নিয়ে আজকাল পন্ডিতেরা বিপুল তর্ক করে চলেছেন; সেসব ঝামেলায় মাথা না গলিয়ে সবাই যেটা মেনে নেয়, সেটুকুই ধরে নিই – প্রথমে তাঁদের চাষ বাসের থেকে পশুপালনের দিকে আগ্রহ ছিল বেশী, তাই আদি নিবাসী কৃষিজীবি কোমেদের সমাজে উর্বরা শক্তিকে মাতা রূপে যে প্রার্থনা করা হতো, তাতে তাঁদের আগ্রহ থাকার কথা নয়। তবে পশুপালন নিয়ে থাকলেও পশুদের চারণভূমি মানে ঘাসজমি তো দরকার; তাছাড়া দিনে দিনে গোষ্ঠীর সদস্য বেড়ে উঠলে খাদ্যের প্রয়োজনও তো বেড়ে থাকতেই পারে। তাই এই শ্রী'র কাছে বৈদিক আর্য্যেরা প্রচুর শস্য আর অন্নবস্ত্র, ধন, সম্পদের জন্য প্রার্থনা করতেন বলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখনকার টানাটানির দিনে আমরা ছেলেপুলে বেশী চাই না, কিন্তু তখন টানাটানি তো তেমন ছিল না আর তখনও নিশ্চয় কাজকর্ম বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনা করার জন্য অনেক বিশ্বাসী আপনজন দরকার পড়ত – শুধু কি তাই ? অন্য গোষ্ঠীর শত্রুরা হামলা করলে যুদ্ধ বিগ্রহ চালনা করার জন্যও তো লোকজন দরকার, আর ছেলেপুলের থেকে আপন আর কে হতে পারে ? তাই শ্রী অর্থে দেখা যাচ্ছে যে শ্রীর কাছে ধন ধন্য গো হস্তী রথ আয়ু – এসব চাওয়ার সাথে সাথে পুত্র, পৌত্র, সবের জন্যই প্রার্থনা

জানানো হচ্ছে। অর্থাৎ শ্রী ছিলেন এমন একটি শক্তি যাঁর কৃপায় ঘর দোর সুরক্ষিত থাকত, সম্পত্তি বৃদ্ধি হত, এবং ছেলেপুলেতে ঘর ভরে যেত।

শ্রী শক্তিকে "দেবী" বলে সব প্রথম বলা হল সাঙ্খ্যায়ন গুহ্য সূক্তে। যদিও তার আগে তৈত্তিরীয় সংহিতায় "শ্রী"কে বহুকেশবতী বলা হয়েছে, অর্থাৎ তাঁর চুল ঘন ও লম্বা –। তার মানে শ্রী তখন থেকেই আর শুধু একটি নৈর্ব্যক্তিক শক্তিমাত্র ছিলেন না, তাঁকে নারী রূপে কল্পনা করা শুরু হয়েছিল। সাঙ্খ্যায়ন গুহ্য সূক্তে এসে দেখা গেল যে বেশ কয়েকটি দেবীর নামের সাথে শ্রী'র নামটাও যোগ করা হয়েছে। এত সব ঘটার পর শতপথ ব্রাহ্মণ বলল যে প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টি করার জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে তপস্যায় বসেছিলেন, কিন্তু টানা তপস্যায় তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লে পরে তাঁর মধ্যে হতে শ্রী শক্তি দেবীরূপে বের হয়ে আসেন। অর্থাৎ এখানেও শ্রী দেবী সেই সৃজনী শক্তিই বটে, তবে তিনি কেবল মাত্র জমিতে ফসলই ফলাচ্ছেন না; তিনি ব্রহ্মার সেই শক্তি যাঁর দ্বারা সমগ্র সৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে। এমন শক্তির কাছে ধন সম্পদ ঐশ্বর্য সবই থাকাটাই তো স্বাভাবিক। এর চেয়ে বেশী লক্ষ্মীর জমজমাট জন্ম কাহিনী বেদ পুরাণে পাওয়া গেল না। "বিষ্ণু পুরাণের"-এ ব্যাসদেব একটি শ্লোকেই লক্ষ্মীর জন্মবৃত্তান্ত শেষ করেছেন, যাতে তিনি খবর দিলেন যে সেকালে ভৃগু নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল, খ্যাতি। এঁদেরই সন্তান লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর দুই ভাই, ধাতা ও বিধাতা।

ওদিকে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ লক্ষ্মীর জন্মের আরেকটি গল্প বলেছেন, সেটি বেশ ইন্টারেস্টিং। গল্পটি এই রকম – নারদ মুনি একবার স্বয়ং নারায়ণকেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে লক্ষীর জন্ম কি ভাবে হলো। নারায়ণ উত্তরে বলেছিলেন যে, "সৃষ্টির অগ্রভাগে রাসমণ্ডলস্থিত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বামভাগ হতে (জীবাত্মারূপিণী) লক্ষ্মীদেবী উৎপন্ন হন। এই দুই মূর্তি রাধিকা ও লক্ষ্মী। কৃষ্ণের বামাংশসম্ভূতা মূর্তি লক্ষ্মী এবং দক্ষিণাংশসম্ভূতা দেবীই রাধিকা। রাধিকা উৎপন্ন হয়েই শ্রীকৃষ্ণকে কামনা করেন আবার লক্ষ্মীও কৃষ্ণকে প্রার্থনা করেন।" বুঝুন ব্যাপারখানা ! দুজন মহিলা একজনকে বিয়ে করতে চাইলে আমাদের যুগে নিশ্চয় ধুন্ধুমার লাগবে, তবে এ হল দেব দেবীদের ব্যাপার। তাই দেখছি যে শ্রীকৃষ্ণ কারুকে নিরাশ করলেননা। তিনি নিজেকে দুটি ভাগ করে ফেললেন। "তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দক্ষিণাংশ হতে দ্বিভুজ ও বামাংশ হতে চতুর্ভুজ, এই দুই ভাগে বিভক্ত হন। পরে দ্বিভুজ মূর্তিতে কৃষ্ণ রাধিকাকে গ্রহণ করেন এবং নিজের চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্তি নিয়ে লক্ষ্মীর প্রার্থনা পূর্ণ করলেন। লক্ষ্মীদেবী স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্ব লক্ষ্য করেন বলে তিনি দেবীগণের মহতী – এজন্য মহালক্ষ্মী নামে খ্যাতা। এভাবেই চতুর্ভুজ নারায়ণ লক্ষ্মীকান্ত হয়েছিলেন।" তাঁদের বাসস্থানের নাম দেওয়া হলো বৈকুণ্ঠধাম।

এটি ছাড়াও আরেকটা গল্পও আছে। সে গল্পটা আমরা বরাবর শুনে এসেছি – সেটা হল যে লক্ষ্মীকে নাকি সাগরের তলা হতে পাওয়া গিয়েছিল। সদাই রগচটা দুর্বাসা মুনি খুশী হয়ে ইন্দ্রকে একটি পারিজাতের মালা দিয়েছিলেন, আর বেচারা ইন্দ্র নিজের বুদ্ধির দোষে সেটিকে নিজের বাহন ঐরাবতের মাথায় পরিয়ে দেন। ঐরাবত হলো হাতী – সে কি আর ফুলমালা বোঝে ? সে দিল মাথাটি ঝেড়ে মাটিতে মালাটি ফেলে – দুর্বাসা তো অপমানে ক্ষেপে অস্থির হয়ে ইন্দ্রকে লক্ষ্মীছাড়া হওয়ার শাপ দিয়ে বসলেন আর তার ফলে লক্ষ্মী সমুদ্রের তলায় গিয়ে লুকোলেন। সাথে সাথে স্বর্গ মর্ত্য সবকিছুই শ্রীহীন হয়ে পড়ল। তখন লক্ষ্মীকে উদ্ধার করতে দেবতারা আর অসুরেরা বাসুকি নাগকে রজ্জু বানিয়ে মন্দার পাহাড়ের চারপাশে জড়িয়ে ক্ষীর সাগরকে ভীষণ রকম মন্থন করেছিলেন। দুই দলের টানাটানির জোরে নাকি বেচারা বাসুকীর মুখ দিয়ে বিষ উঠে এসেছিল; ভাগ্যে শিব ঠাকুর সেটি চুমুক দিয়ে খেয়ে নিয়েছিলেন, নাহলে তো বিশ্বসংসার গিয়েছিল আর কি! শিব মৃত্যুঞ্জয় বলে বেঁচে রইলেন। বিষ তাঁর গলা বেয়ে নামতেই পারল না, তবে গলাটি বিষ আটকে নীল হয়ে রইল। সেই সাগর ছেঁচার পর শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মীকে পাওয়া গিয়েছিল; তার পর তিনি সেই ক্ষীর সমুদ্রের ভিতর হতে উঠে এসে সামনে নারায়ণকে দেখে স্বয়ম্বর করে তাঁর স্ত্রী হলেন। তাই সমুদ্রমন্থন হলো লক্ষ্মীর দ্বিতীয় জন্মের কাহিনি। এখানে তিনি সাগরের কন্যা। এইখানেই খটকা লাগছে – এই গল্পটি কোথা থেকে এলো ? উত্তর খুঁজতে আবার সেই পুরাণের প্রসঙ্গেই ফিরে যাই। ওই যে বলেছিলাম না যে পুরাণ হলো সৃষ্টি সম্বন্ধে দার্শনিক ভাবনা চিন্তাকে গল্পচ্ছলে মানে রূপকের মাঝে বলা গল্প। সে গল্পে যাঁরা গল্প বলছেন তাঁদের বর্ণনায় সে সময়কার সমাজব্যবস্থা এবং তাঁদের অভিজ্ঞতা, জানা অজানা ধারণা, কল্পনা সব মিশে থাকে। তা এই

সাগর হতে লক্ষ্মীকে পাওয়ার গল্পটা পাওয়া যাচ্ছে আমাদের বাংলায় সমধিক প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আর বিষ্ণুপুরাণে। দেখুন কি বলা হচ্ছে –

ততঃ স্ফুরৎকান্তিমতী বিকাসিকমলে স্থিতা – শ্রীর্দেবী পয়সস্তস্মাদুত্থিতা ভূতপঙ্কজা।।

(বিষ্ণুপুরাণ, ১/৯/৯৯)

অর্থাৎ ক্ষীরসমুদ্র হতে ফুটে ওঠা পদ্মফুলের উপর বসে থাকা অপরূপ রূপ লাবণ্যময়ী পদ্মফুল সদৃশা শ্রী দেবী উঠে এলেন।

বিষ্ণুপুরাণেই মহালক্ষ্মী স্তুতিতে লক্ষ্মীর আটটি রূপ বর্ণনা করা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের শ্রী বৈষ্ণব সম্প্রদায় গোষ্ঠী এই আটটি রূপের পূজা করেন। আমাদের বাংলায় অবশ্য আমরা একটি লক্ষ্মীকেই পূজা করি, কিন্তু দেখুন ওই আটটি রূপের মধ্যে আমার আপনার চেনা অনেক দেবীর কথা মনে পড়বে –

১. আদি লক্ষ্মী – মূল শক্তি – চারটি বাহুতে রক্ত কমল, রক্ত পতাকা, অভয় ও বরদা মুদ্রা ধারিনী। তিনি আত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতি করেন।

২. ধন লক্ষ্মী – সম্পদ দেন। ছয়টি বাহুতে শঙ্খ, সোনার কলস ভরা মোহর, ধনুক বাণ, পদ্ম ও অভয় মুদ্রা ধারণ করে রয়েছেন।

৩. ধান্য লক্ষ্মী – অষ্টভুজা, হরিৎ বসনা, দুটি পদ্ম ফুল, ধান, আখ, কলা গদা ও অভয় আর বরদ মুদ্রা ধারিণী।

৪. গজ লক্ষ্মী – শক্তি স্বরূপা, রক্ত বসনা, চতুর্ভুজা, দুটি হাতে দুটি পদ্ম ফুল, অন্য দুটি হাতে অভয় ও বরদ মুদ্রা। তার দুই পাশে দুটি হাতি শুঁড় তুলে কলস হতে জল ঢেলে তাঁর বন্দনা করছে। এই রূপে দেবী রাজ ঐশ্বর্য্য দেন। আমাদের ধনপতি সওদাগরের কাহিনীতে কমলে কামিনীর ছবিটি বোধহয় এখান থেকে পাওয়া গিয়েছে।

৫. সন্তান লক্ষ্মী – সন্তান সন্ততি দাত্রী, ষড় ভুজা দেবী। দুইটি জলভরা কলস ধারিনী, তার একটিতে আমের পল্লব ও অপরটিতে নারিকেল রাখা। অপর দুটি হাতে ঢাল, তরোয়াল, শিশু ও অভয় মুদ্রা। কোলে ধরে আছেন আরেকটি শিশু। আমাদের বাংলা দেশে পূজিত ষষ্ঠী দেবীর সাথে এঁর সাদৃশ্য স্পষ্ট।

৬. বিজয় লক্ষ্মী – অষ্টভুজা, নীলাম্বরা, শঙ্খ, চক্র, ঢাল, তরোয়াল, পদ্ম, পাশ ধারিণী। বাকী দুই হাতে অভয় ও বরদ মুদ্রা। এই রূপে দেবী রণক্ষেত্রে বা সংসারে সকল বাধা দূর করে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দেন।

৭. বীর লক্ষ্মী – রক্তাম্বরা, অষ্টভুজা, সিংহবাহনা। তাঁর বাহুতে শঙ্খ, চক্র, ধনুক, বাণ, ত্রিশূল বা তলোয়ার, ও পুঁথি ধারণ করে রয়েছেন। অন্য হাতটিতে বরাভয় মুদ্রা।

আপনাদের মনে হচ্ছে না যে আমাদের বাংলায় মা দুর্গার যে রূপটি আমরা পূজা করি, সেটি এই রূপ দুইটি দ্বারা অনুপ্রাণিত? তাই যদি মনে হয়, তাহলে খুব ভুল ভাবছেন না।

৮. বিদ্যা লক্ষ্মী – শ্বেতাম্বরা, ময়ূরবাহনা, দুটি হাতে বেদ ও ময়ূর পুচ্ছের লেখনী ধরে রয়েছেন অন্য দুটি হাতে বরদ মুদ্রা। এই রূপটি আমাদের সরস্বতী মূর্তির সবচেয়ে কাছাকাছি।

তাহলে দেখা গেল যে আমরা বাঙালীরা যদিও মূলতঃ তাঁকে ঐশ্বর্যের দেবী বলি, কিন্তু পুরাণের যুগে লক্ষ্মীকে এমন একটি দেবী হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে, যিনি শুধু ধনদৌলত নয়, ক্ষেত খামার, ছেলেপুলে, যুদ্ধ বিগ্রহ, বীরত্ব – সবেতেই সাফল্য এনে দেন।

যাই হোক, আরেকটিও তো ভাবার কথা ... আমরা যে বলি লক্ষ্মী হলেন শিব-পার্বতীর সন্তান, সে পরিচয়টি কবে তৈরী হল ? খুঁজে পেতে দেখা যাচ্ছে যে সে ব্যাপারটি খুব বেশিদিন আগের নয়, এই ধরুন প্রায় ছশো বছর আগে মানে ত্রয়োদশ হতে অষ্টাদশ শতাব্দীর সময়কালে। ওই সময়টা বাংলায় রচিত হয়েছিল মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্য কি নিশ্চয় আপনাদের বলে দিতে হবেনা। ইস্কুলে পড়ার সময় সকলকেই মঙ্গল কাব্যের সাথে পরিচিত হয়েছে। এই সব কাব্যে আদি জন গোষ্ঠীর কাছে যে সব দেবী দেবতারা পূজা পেয়ে এসেছেন, লোকের বিশ্বাস তাঁদের বৈদিক দেবী দেবতাদের সাথে মিলিয়ে নিয়ে নতুন এক দেব সমাজের সৃষ্টি করল ও লোকের মঙ্গল হবে, এই বিশ্বাসে তাঁদের নিয়ে কাব্য রচিত হতে লাগল। বাংলার লোকসমাজ নতুন গল্প তৈরি করল, গান বানিয়ে ফেলল মুখে মুখে। তারপর তাদের সেই মৌখিক সাহিত্য লিখিত রূপ পেল মঙ্গলকাব্যের যুগে এসে। মনসা মঙ্গল, চন্ডী মঙ্গল, ধর্ম মঙ্গল, এই তিনটি ছাড়াও 'শিবায়ন', 'দুর্গা মঙ্গল' নানা মঙ্গলকাব্যের গান কবিতা বাঙালীর জীবনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। এই সময় বাংলার লোকের মুখে লক্ষ্মী আর সরস্বতী হলেন শিব আর পার্বতীর মেয়ে। এই সময় হতেই শারদ দুর্গা পূজা হল বাঙালীর জীবনের প্রধান উৎসব। মায়ের সঙ্গে পুত্রকন্যা হিসেবে কার্তিক-গণেশের পাশাপাশি লক্ষ্মী-সরস্বতীরও আগমনের একটা প্রথা তৈরি হল।

(চলবে)

দেবীপ্রিয়া রায় — লিখছেন স্কুল ও কলেজের দিন থেকে। পেশায় দর্শন ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপিকা ও গৃহিণী। কাশীর প্রবাসী বাঙালী পরিবারের মেয়ে দেবীপ্রিয়া কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ সালে ডক্টরেট করে বিবাহসূত্রে সেই বছরেই আমেরিকা এসে শিকাগো শহরে বাসা বাঁধেন। গত ৪০ বছর শিকাগোর বাঙালী ও অবাঙালী সমাজের সাথে নানা ভাবে জড়িয়ে রয়েছেন। সাহিত্য চর্চা দেবীপ্রিয়ার নেশা। শিকাগোর উন্মেষ সাহিত্য গোষ্ঠীর তিনি অন্যতম সদস্য।

রমা জোয়ারদার

চার বুড়ির গল্প

পর্ব ১

সে বছর বৈশাখ মাস পড়তে না পড়তেই চড়চড়িয়ে গরম পড়েছিল। কিন্তু মাসের মাঝামাঝিতে হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি হয়ে দিন সাতেকের জন্য একেবারে মনোরম আবহাওয়া। ঠিক সেই সময় আরাম আবাসের আমরা চার বন্ধু মিলে ঠিক করলাম যে কোথাও একটা বেড়াতে যেতে হবে।

একদিনের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ পত্র, জামাকাপড় ইত্যাদি গুছিয়ে সঙ্গে নিলাম। তারপর সপ্তাহের একেবারে মাঝখানে (কারণ, আমাদের উইক-এন্ড লাগেনা – সব দিনই ছুটির দিন!) একটা ঝিরঝিরে বৃষ্টি ঝরা সকালে আমরা চারজন রওনা দিলাম। সুনন্দাদিকে সব সময় দেখাশোনা করে শ্যামা! সেও আমাদের সঙ্গে রইলো! শ্যামার বয়স পঁয়তিরিশ এর কাছাকাছি। বেশ ঝরঝরে, স্মার্ট মেয়ে। একটা কোয়ালিস গাড়িতে ড্রাইভার এবং আমরা পাঁচজন উঠে পড়লাম।

রওনা হবার মুখে আমাদের একজন সহ-আবাসিক প্রমীলা বলল – "বলিহারি তোমাদের, এই বুড়ো বয়সে শখ কম না! বৃষ্টি বাদলা মাথায় করে বেড়াতে চলেছ!"

কথাটা পড়তে সময় পেল না। চিত্রাদি উত্তর দিল – "বুড়ো ? বুড়ো কাকে বলছ গো ? আমরা তো সত্তরোর্ধ্ব চারটি কিশোরী!"

সুনন্দাদি মিষ্টি হেসে বলল – "মনের উপর কি আর বয়সের ভার জমে? ও তো পদ্মপাতায় জল! টোকা দিলেই ঝরে পড়ে যায়।"

কলকাতার চেনা রাস্তার ভীড়-ভাড় ছাড়িয়ে গাড়ি চলল অচেনা নিরিবিলি রাস্তা ধরে। এখন বৃষ্টি আর পড়ছে না। আমরা গাড়ির জানালা খুলে দিলাম। দু'পাশের সবুজ থেকে ভিজে মাটির গন্ধ উঠে এল। মাটি বলল – "আবার আমি নতুন হলাম!"

ভিজে হাওয়ার ঝাপটা মেরে বাতাস বলল – "মনের জানলা খুলে দিয়ে চল ছুটে চল, আমার সাথে!"

আকাশের জলভরা মেঘ বলল – "উধাও মনের পানসীখানা ভাসিয়ে দিয়ে সুরের ভেলায় চল ভেসে যাই অচিন দেশে!"

আমাদের আর পায় কে? গলা মিলিয়ে চারজন তখন গান ধরেছি – "আমাদের যাত্রা হল শুরু, এখন ওগো কর্ণধার, বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক ফিরবো না গো আর! ..."

সেই গানের গুঁতোয় রাস্তার সাইকেল বা স্কুটারে চড়া লোকজনের হাসি আর থামে না। ভাগ্যি ভালো, আমাদের কর্ণধার অর্থাৎ ড্রাইভার অর্জুন গান শুনেও অবিচলিত রইল!

ঘন্টা দেড়েক বাদে আবার ঢুকলাম এক শহরের অলিগলিতে। বেশি নয়, অল্প একটু পথ। তারপর মস্ত একটা লোহার গেটের সামনে গাড়ি থামলো।

গেট খুলতেই – চিচিং ফাঁক! ভেতরে গাছপালা ভরা এক চমৎকার রেসর্ট। গাছ-গাছালির মাঝে মাঝে খড়ের চাল দেওয়া মাটির ঘর। সব কিছু মিলিয়ে জায়গাটা ভুলে যাওয়া কোনো আশ্রমের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল! গেটের পাশে ছোট একটা অফিস ঘর। আমি আর চিত্রাদি সেখানে ঢুকলাম নিয়ম মাফিক খাতায় সই-সাবুদ ইত্যাদি করার জন্য! সামনেই বাগানের মধ্যে চারপাশ খোলা এবং মাথায় ছাদঅলা একটা সুন্দর বসার জায়গা। তাপসী, সুনন্দাদি আর শ্যামা সেখানে

বসল। অফিসের কাজকর্ম সেরে আমরা দুজনেও সেখানে পৌঁছতেই রেসর্ট থেকে আমাদের একটা ঠাণ্ডা, সুস্বাদু পানীয় দিল। বাইরে তখন বেশ গরম। শরবত খেয়ে প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল! এরপর দুটি ছেলে জিনিসপত্র সহ আমাদেরকে ঘরের দিকে নিয়ে চলল। দু-পাশে নানারকম ফুল-ফলের গাছ। মাঝখান দিয়ে লাল মোরাম বিছানো সরু রাস্তা!

বাগানের মধ্য দিয়ে অল্প একটু পথ পেরিয়ে ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। উঁচু দাওয়ার উপর মাটির ঘর। বাঁশ আর কাঠের তক্তা দিয়ে বানানো নড়বড়ে তিনধাপের সিঁড়ি। খুব সাবধানে আমরা সেই সিঁড়ি ভেঙে দাওয়ায় উঠলাম। ছেলে দুটি তালা খুলে জিনিস পত্র ঢোকাতে গিয়ে বলল – "এর পাশের ঘরটাও আপনাদের। মালগুলো কোনটা কোথায় যাবে, যদি একট ...!

চিত্রাদি আর তাপসী এক সঙ্গে বলে উঠল – "এখন সব এখানেই রাখ। এখানে একসাথে বসে কফি খাব। তারপর দেখা যাবে !"

মাঝপথে বা ধা দিয়ে আমি বললাম –

"কফির সাথে গরম-গরম পাকোড়া চাই কিন্তু !"

"ভেজিটেবল পকোড়া আর পেঁয়াজি যেন থাকে!" সুনন্দাদি যোগ দিল।

বাইশ-চব্বিশ বছরের রোগা রোগা দুটি ছেলের মধ্যে একজন মনে হয়, একেবারে নতুন কাজে যোগ দিয়েছে। সে জিনিসপত্রগুলো ঘরের এক কোণায় রেখে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্য ছেলেটিই আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিল, ঘরের কোথায় কি আছে, কিছু দরকার হলে কোথায় বলতে হবে, রেস্টুরেন্টটা কোথায় ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের শ্যামাও ঘরে ঢোকার পর থেকে বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ও বুঝে গেছে, কথা বলতে আমরা যতটা ওস্তাদ, কাজে কর্মে ততটাই বেকার। চার বুড়ির এই দুদিনের ঘর গেরস্থালি তাকেই সামলাতে হবে। তাই সে কোথায় চা, কোথায় জল, কোথায় তোয়ালে এবং কোন টিভি চ্যানেল কত নম্বরে পাওয়া যাবে ইত্যাদি সব বুঝে নিল। ঘরটা বাইরে থেকে দেখলে মাটির ঘর। কিন্তু ভিতরে ঢুকলে পুরো আধুনিক, এয়ার কন্ডিশনার, অ্যাটাচড বাথ ইত্যাদি সব সুযোগ সুবিধা রয়েছে।

চিত্রাদি বলল – "আমাদের কিন্তু একটা এক্সট্রা বেড লাগবে। আগেই বলে দিয়েছিলাম।"

ছেলেটা মাথা নেড়ে বলল – "কোনো চিন্তা নেই। পেয়ে যাবেন।"

একটু থেমে ছেলেটা আবার বলল – "আপনাদের দেখে আমাদের খুব ভালো লাগছে। এই বয়সে আপনারা বন্ধুরা মিলে কেমন আনন্দ করে বেড়াতে এসেছেন। আবার এখানে পৌঁছেই বললেন – কফি, পকোড়া খাবেন! আমরা তো এখনই কেমন বুড়িয়ে গেছি। যখন তখন ভাজাভুজি খেতেও ভয় করে। মনে হয় অম্বল হবে। আপনাদের বয়স পর্যন্ত যদি বা বেঁচে থাকি, আপনাদের এই প্রাণ-শক্তির দশ ভাগের এক ভাগও আমাদের থাকবে না। আমরা জ্যান্ত-মরা হয়ে বেঁচে থাকব।"

ছেলেটির কথায় আমার মনে যেন সপাং করে একটা চাবুকের ঘা পড়ল! আমরা চার বুড়িতে আজ এখানে আনন্দ করে বেড়াতে এসেছি। অথচ আমাদের নাতির বয়সী এই ছেলেটা এখানে আধমরা হয়ে, হতাশায় ভুগছে!

আমি জিজ্ঞাসা করে জানলাম – ওর নাম বিমান! ছেলেটাকে উৎসাহ দিয়ে আমি বললাম – "এরকম কেন ভাবছ? কতটুকু বয়স তোমার? সামনে এখনও পুরো জীবন পড়ে আছে। ভালো দিন নিশ্চয়ই আসবে। মনে আশা রাখ!"

বিমান ম্লান হেসে বলল – "কি করে আশা রাখব ম্যাডাম? কলেজে পড়ছিলাম। কোভিডের সময় পড়া বন্ধ হয়ে গেল। বাবার কাজকর্ম চলে গেল। না খেয়ে মরার অবস্থা তখন আমাদের। চারিদিকে পাগলের মত কাজ খুঁজেছি তখন! উল্টো পাল্টা যা পেয়েছি, সে কাজই করেছি। তারপর গত বছর এই কাজটা পেলাম। যাহোক, নিয়মিত কিছু অন্তত আসছে।"

তাপসী জিজ্ঞাসা করল – "বাড়িতে কে কে আছে ?"

"মা, বাবা আর ছোট বোন।" উত্তর দিয়েই বিমান এবার হেসে বলল – "আপনাদের আশীর্বাদে বোনের পড়া চালু রাখতে পেরেছি। বোন পড়া-শোনায় খুব ভালো। গত বছর উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে কলেজে পড়ছে।" বলতে বলতেই তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল!

আমরা সবাই উৎসাহ দিয়ে বললাম – "বাহ, এ তো খুব ভালো কথা!" বিমান এবার ব্যস্ত হয়ে বলল – "আচ্ছা, আমি তাহলে যাই? পকোড়া আর কফি পাঠিয়ে দেবো।"

সে বেরিয়ে যাবার পর সুনন্দাদি শ্যামার দিকে তাকিয়ে বলল – "দেখেছিস তো, সব জায়গায় একই গল্প! তোর কষ্টটা আলাদা কিছু নয়।"

আমি কৌতুহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম – "মানে ? শ্যামার আবার কি গল্প?"

সুনন্দাদি ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে শ্যামাকে বলল – "সরি, সরি শ্যামা। সকলের সামনে আমার এই কথাটা বলা উচিত হয়নি। এটা তোর নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার!"

কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে শ্যামা বলল – "ব্যক্তিগত আর রইল কোথায়, দিদা? এখন তো সবাই সব জানে। আর সত্যি বলতে কি, এখন তো অনেক ঘরের লোকের চেয়ে তোমরাই আমার বেশি আপন!"

শ্যামার গল্পটা শ্যামা নিজেই বলেছিল –

কাঁচড়াপাড়ার কাছে গৌরীপুরে ওদের বাড়ি ছিল। বাবা, মা আর তিন ভাই বোনের সংসার। বাবার একটা মুদি দোকান ছিল। ভাইয়েরা একজন রঙের কারখানায়, অন্যজন একটা ছাপাখানায় কাজ করত। প্রাচুর্য ছিল না। কিন্তু মোটামুটি খেয়ে পরে ভালোই দিন কাটত তাদের।

হঠাৎ একেবারে বিনা মেঘে বজ্রপাত হল। একদিন শহরের বাজার থেকে মাল কিনে ফিরবার সময় ওদের বাবা বাস দুর্ঘটনায় আহত হলেন। আঠেরো দিন হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করা হয়েছিল। কিন্তু বাঁচানো গেল না! এরপরেই শুরু হল গণ্ডগোল।

শ্যামা বলছিল, বাবার চিকিৎসায় জলের মত টাকা খরচা হয়েছিল – অনেক ধার হয়ে গিয়েছিল। বাবা মারা যাবার পর ধার শোধ করার জন্য দাদারা মুদির দোকানটা বিক্রি করে দিল। তার কয়েক মাস পরে দাদা মাকে বলল – "শ্যামার জন্য ভালো একটা ভাল পাত্রের সন্ধান পেয়েছি। দাবি দাওয়াও তেমন কিছু নেই! ভাবছি, এই অগ্রহায়নেই বিয়েটা দিয়ে দেবো।"

আমি তখন ক্লাস টুয়েলভ-এ পড়ছি!

মা একটু আপত্তি জানিয়েছিল – "কদিন পরেই তো পরীক্ষা! টুয়েলভ এর পরীক্ষার পর বিয়েটা দিলে হত না? ততদিনে বিয়ের জোগাড়টাও একটু করে নিতাম!"

দাদা বলল – "নুন আনতে পান্তা ফুরায়, তার আবার বিয়ের জোগাড়! দেরী করলে পাত্র হাত-ছাড়া হয়ে যাবে।"

ছোড়দাও দাদার কথায় সায় দিল। আমি অনেক করে বলেছিলাম – "উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর বিয়ে দিও। কিন্তু কেউ তাতে পাত্তাই দিল না! যা হোক, বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর প্রথমটায় ভালোই ছিলাম। দুই আড়াই বছর পর ছেলে হল। তারপর, ধীরে ধীরে আমার বরের মতি গতি পাল্টাতে লাগল। সে অন্য ফুলে ওড়া-উড়ি শুরু করল। আমি আটকাতে চেষ্টা করেছিলাম। কিছু লাভ হল না। ছেলের যখন পাঁচ বছর বয়স তখন আমার বর অন্য মেয়ে নিয়ে সংসার করতে চলে

গেল। সে সময় আমার একেবারে দিশেহারা অবস্থা! ভাইদের সংসারে আমার যে কি হাল হবে, জানতাম! তাই সেখানে আর যাইনি। উল্টে আমি মাকে আমার কাছে নিয়ে এলাম। ছেলেকে মায়ের কাছে রেখে আমি লোকের বাড়িতে রান্নার কাজ শুরু করলাম। বাকি সময়ে টুকটাক সেলাই-এর কাজ করতাম। এরপর আরো অন্য রকম কাজ, মানে যখন যেমন পেয়েছি, তখন তেমন করেছি! এভাবেই এক সময় হাসপাতালে আয়ার কাজে ঢুকলাম। তখন হাসপাতালের পক্ষ থেকে কিছুটা ট্রেনিংও পেলাম। তার জন্যই তো এই দিদাকে দেখাশোনার কাজটা পেলাম। কথাটা বলে শ্যামা সুনন্দাদিকে এক হাতে জড়িয়ে ধরল । সুনন্দাদির মুখটা স্নেহের হাসিতে ভরে উঠল।

শ্যামার গল্পের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের কফি আর পকোড়া খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। এবার আমি আর তাপসী আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলাম। ঠিক হল, সবাই মুখ হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে, একটু বিশ্রাম নিয়ে তারপর একটা নাগাদ লাঞ্চে যাব।

দুপুরবেলা রেসর্টের রেস্টুরেন্ট-এ যাবার জন্য ঘর থেকে বেরোতেই গরম টের পেলাম – রোদও খুব চড়া। বাগানের মধ্যে দিয়ে কিছুটা এগোতেই বাঁ দিকে সুইমিং পুল। কয়েকজন উৎসাহী যুবক তখন হৈ চৈ করে পুলের মধ্যে বল ছোঁড়া ছুঁড়ি করছিল। আমি আর তাপসী একই সাথে বলে উঠলাম – "চিত্রাদি, তুমি যে এখানে সুইমিং পুলে বসে থাকবে বলেছিলে! এই তো পুল। যাবে নাকি ?"

– যাবোই তো। আগে লাঞ্চ সেরে নিই। শ্যামাও আমার সাথে থাকবে বলেছে। "কি রে পুলে নামবি তো?"

– "নামবই তো!" শ্যামা অত্যন্ত জোরের সাথে বলল! "আর শুধু নামব না, আমি তোমার সুইম-স্যুট পরা ছবিও তুলব। যা সুন্দরী তুমি! দারুন ছবি উঠবে!"

সুনন্দাদি হাসতে হাসতে বলল – সেই ভালো। চিত্রা আর শ্যামা জলপরীদের মত সাঁতার কাটবে, আর আমরা পাড়ে বসে বসে সেটা দেখব। কারণ, আমরা তো সাঁতার কাটতেই পারি না।"

কথা বলতে বলতে আমরা রেস্তোঁরায় পৌঁছে গেছিলাম। একেবারে ফাঁকা জায়গায় একটা নতুন বাড়ি, তার দোতলাটা রেস্তোঁরা।

রেস্তোঁরার একদিকের দেওয়াল জুড়ে বড় বড় জানলা। আমরা জানলার পাশের একটা টেবিল নিয়ে বসলাম।

জানলার বাইরে তাকিয়ে মনটা জুড়িয়ে গেল। অনেক দূর পর্যন্ত বাড়িঘর, রাস্তা-ঘাট, গাড়ি, ঘোড়া কিচ্ছু নেই! কাছে দূরে, ছোট বড় গাছের সারি আর সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ। এশপাশে একটা পুকুরও আছে। ভারী স্নিগ্ধ পরিবেশ। ওয়েটার এল, আমরা খাবারের অর্ডার দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, খাবার আসতে কতক্ষণ লাগবে? ছেলেটি উত্তর দিল, কুড়ি পঁচিশ মিনিট লাগবে। আমরা সবাই এক গেলাস ফ্রেশলাইম সোডা নিয়ে বেশ মৌজে আড্ডা দিচ্ছিলাম। আমাদের মুখোমুখি একটা টেবিলে বেশ কয়েকজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা খেতে খেতে বারবার কৌতুহলী দৃষ্টিতে আমাদের দিকে দেখছিল, আর নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করছিল। ওইভাবে তাকাতে দেখে আমি ওদের দিকে চেয়ে হেসে ফেললাম! এবার ওদিক থেকে প্রশ্ন এল – "কোথা থেকে আসছেন আপনারা ?"

"নিউ টাউন!" আমরা উত্তর দিলাম।

একজন জিজ্ঞেস করল – "আপনারা কি কলেজের বন্ধু ? নাকি আরও ছোট বেলার বন্ধু ?"

"আমরা বুড়ো-বেলাকার বন্ধু!" রহস্য করে উত্তর দিল সুনন্দাদি।

ওরা এবার মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। কথাটা ঠিক বুঝল কিনা জানিনা। চিত্রাদি সেটা বুঝে, বেশ খোলসা করে হাসিমুখে জানাল – আমরা সবাই "আরামাবাস সিনিয়র লিভিং"-এ থাকি। সেখান থেকেই আসছি।

এই কথায় ওরা যেন আরো চমকিত হল! – "ওমা, তাই ?" বলতে বলতে দুজন মহিলা এবার কৌতুহলে নিজেদের টেবিল ছেড়ে সোজা আমাদের টেবিলের কাছে চলে এলো ! একটুক্ষণের মধ্যে পুরো দলটাই আমাদের টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে গেল। গল্প জমে গেল। বৃদ্ধাশ্রমের চারজনকে এই রকম ভাবে বেড়াতে বেড়িয়ে, মস্তি করতে আর আড্ডা মারতে দেখে ওরা একেবারে চমৎকৃত হয়ে গেছে!

গল্পে গল্পে সময়টা খেয়াল করিনি। তাপসীর দিকে চোখ পড়তেই মনে হল ও যেন ঠিক নেই! আমি জিজ্ঞেস করলাম – "তাপসী, তোমার শরীর কি ঠিক লাগছে না ?"

তাপসী মাথা নেড়ে বলল – "না না, ঠিক আছি। কিন্তু খাবার তো দিল না ?"

সুনন্দাদি বলল – "সত্যি কিন্তু। কুড়ি মিনিটে খাবার দেবে বলল! অথচ এক ঘন্টা হয়ে গেল। খুব খিদে পেয়েছে। ওষুধ খাবারও সময় হয়ে গেছে !"

আমার মনে পড়ে গেল, তাপসীর সুগার-এর প্রবলেম আছে। এতক্ষণ না খেয়ে নিশ্চয়ই ওর সুগার লেভেল ড্রপ করছে! সেই জন্যই ওকে এরকম লাগছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে একজন ওয়েটারকে ডেকে খাবার দিতে বললাম। এই দিচ্ছি, এই দিচ্ছি করে আরো পাঁচ মিনিট গেল। সুনন্দাদি ব্যাগ থেকে একটা পিপারমেন্ট লজেন্স বার করে তাপসীর মুখে ঢুকিয়ে দিল!

আমি আর চিত্রাদি এবার উঠে ম্যানেজারের টেবিলে গিয়ে রাগারাগি শুরু করলাম! ম্যানেজার বলবার চেষ্টা করছিল যে মাছটা হতে সময় লাগছে! আমরা বললাম – "মাছ লাগবে না। যা হয়েছে, তাই দিন। আমাদের পরে আরো কতজন এল, তাদের খাবার এসে গেল। অথচ আমাদেরকে দিচ্ছেন না! কেন বলুন তো ? বুড়ো মানুষ বলে ? ভাবছেন, আমাদের পাত্তা না দিলেও চলে! কিন্তু মনে রাখবেন আপনাদের দেরী করার জন্য আমাদের বন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। ওর কিছু হলে আপনারাও কিন্তু বিপদে পড়বেন !"

এবার নতুন আলাপ হওয়া অন্য দলের লোকেরাও আমাদের সমর্থনে এগিয়ে এল! সমূহ বিপদ বুঝে ম্যানেজার তখন চেয়ার ছেড়ে দৌড়ে রান্নাঘরে ঢুকলো, এবং দু-মিনিটের মধ্যেই আমাদের টেবিলে খাবার এসে গেল।

ডাল, পোস্ত, ভেটকি মাছের পাতুরি আর আম-দই দিয়ে খাওয়াটা দারুণ হল! সুস্বাদু খাবার খেয়ে আমাদের মধ্যের রাগটা একেবারেই মিইয়ে গেছিল! তবুও বেরোনোর সময় যথাসাধ্য গম্ভীর মুখে ম্যানেজারকে বললাম – "ডিনারের অর্ডার আমরা সাড়ে সাতটায় দিয়ে দিলে সাড়ে আটটায় খাবার দিতে পারবেন তো ?"

লম্বা করে মাথা নেড়ে ম্যানেজার উত্তর দিল – "অবশ্যই অবশ্যই। আজকের ঘটনার জন্য আমরা খুব দুঃখিত। এরকম ভুল আর হবে না। খাওয়ার জন্য আপনাদের রেস্টুরেন্টে আসতে অসুবিধা হলে এত দূরে আসতে হবে না। আপনাদের ঘরেই বড় টেবিল লাগিয়ে খাবার সার্ভ করব।"

আমরা চার বুড়ির দল দিগ্বিজয়ীর ভঙ্গিতে দৃপ্ত পদক্ষেপে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এলাম।

বিকেল বেলা চা খেয়ে রেসর্টটা ঘুরে দেখব বলে বেরোলাম। ততক্ষণে রোদ পড়ে গেছে, সন্ধ্যা হতে বেশি দেরি নেই। আসলে দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে ঘরে যেতে যেতেই তিনটে বেজে গিয়েছিল। তারপর একটু বিশ্রাম নিতে গিয়েই বেলা গড়িয়ে গেল। ভাগ্যিস শ্যামা সঙ্গে ছিল। ও-ই চা বানিয়ে আমাদের ডেকে তুলল।

বাইরে বেরিয়ে খুব ভালো লাগলো। মনে হয় কাছেই কোথাও বৃষ্টি হয়েছে! বৃষ্টি ভেজা ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছিল। রেসর্টে অনেক রকম ফুল গাছ, ফলের গাছ রয়েছে। বাগানের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা পথ। আমরা পাঁচজন টুকটাক গল্প করতে করতে ধীর পায়ে হেঁটে চলেছি।

– "এই দ্যাখ, মোরগঝুঁটি ফুল! আমাদের বাড়ির বাগানে ছিল। কতদিন বাদে দেখলাম !"

– "মোরগঝুঁটির পাশে ওটা কি ফুল ? বলো তো, দিদা !"

– "ওটা তো বোতাম ফুল। এই দ্যাখ, এই বড় গাছটা ! গোল গোল পাতা। চিনিস ? এটা হল কাঞ্চন !"

রেসর্টটা বেশ বড়। আমরা হাঁটতে হাঁটতে যেখানে পৌঁছলাম সেখানে দেখি একটা লেকও আছে। লেকের জলে নোঙর করা নৌকা ভাসছে। আশেপাশে লোকজন নেই। পাশ দিয়ে একজন রেসর্টের কর্মচারী যাচ্ছিল। আমাদের নৌকার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল – "এখন তো সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, এখন আর নৌকা চলবে না। কাল দিনের বেলা আবার চলবে !"

আমাদের অবশ্য আদৌ নৌকা চড়ার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু সেটা নিয়ে কিছু আর বললাম না। লেকের উপর সুন্দর একটা ব্রীজ। লেকের মাঝ বরাবর ব্রীজটা গিয়ে যুক্ত হয়েছে নৌকা আকৃতির একটা বসার জায়গার সাথে। আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। কিছু লোকজন যারা বেড়াতে এসেছে, তারা ওদিকের বাগানে ঘুরছে। সেখানে কিছু ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ছোটাছুটি করে খেলছে। কেউ কেউ আবার সুইমিং পুলের দিকে আইসক্রিম পার্লারে বসে আছে। নামে আইসক্রিম পার্লার, কিন্তু আইসক্রিম ছাড়াও আরো অনেক কিছুই সেখানে পাওয়া যায়। আমরা জলের উপরের ব্রীজ ধরে হেঁটে গিয়ে নৌকাতে বসলাম! তখন দিনের আলো নিভে আসছে। লেকের কালো জলে কোথাও কোথাও লালের ছোঁয়া লেগেছে! শ্যামা জিজ্ঞেস করল – "দিদা, তোমরা কি এখন এখানে খানিকক্ষণ বসবে ?"

চিত্রাদি বলল – "বসতেই পারি কিছুক্ষণ। কেন রে, তোর কি কোনো তাড়া আছে ?"

"না, মানে, তোমরা যদি এখানে বস তো আমি ওপাশে গিয়ে বাড়িতে একটু ফোন করব। বেশি দুরে যাবো না। ডাকলে চলে আসব !"

রেসর্টের বাগানে, লেকের ধারে ধারে, ব্রীজের উপরে আলো জ্বলে উঠেছে। চারিদিকে কেমন একটা মায়াবী পরিবেশ। অনেক রকম আওয়াজ, কথাবার্তা ভেসে আসছে। কিন্তু আধো অন্ধকারের আড়াল আমাদের চারপাশে একটা অদ্ভুত নির্জনতা এনে দিয়েছে !

চিত্রাদি বলল – "আমার কিন্তু বেশ লাগছে। চারিদিকে জল ! মনে হচ্ছে যেন সত্যিকারের নৌকায় বসে আছি !"

আমার হঠাৎ অনেক পুরনো একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় আমি হেসে ফেললাম। সবাই অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল – "কি ব্যাপার ? তুমি ও'রকম হাসলে কেন ?"

"নৌকা চড়ার কথায় আমার অনেক বছর আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। সে সব মনে পড়তেই হাসি এসে গেল !"

এরপর আমাকে আর বিশেষ অনুরোধ করার দরকার হল না। আমি বলতে শুরু করলাম।

"আমি তখন কলেজে, ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। উত্তর কলকাতার একটা হোস্টেলে থাকতাম। একটা ছুটির দিনে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে ঠিক করলাম আউটরাম ঘাটে বেড়াতে যাব। সকালে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। দিনটা ছিল মেঘলা। আমি মফঃস্বলের মেয়ে। কলকাতার বিশেষ কিছু চিনি না। আমাদের দলে আমার মত আরো দু-তিন জন ছিল। তবে আমাদের দলেরই কেউ কেউ আবার মোটামুটি ভাবে শহরের কোথায় কি আছে, কিভাবে যেতে হবে, সে সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল ছিল! আমরা দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে ছয় জনের একটি দল বেরিয়ে পড়লাম, এবং নিরাপদে আউটরাম ঘাটে পৌঁছে গেলাম! আমার খুব উৎসাহ। আউটরাম ঘাটের নাম অনেক শুনেছি। কিন্তু এই প্রথম দেখলাম। দেখে অবশ্য

একটু হতাশ হয়েছিলাম! কিছুই তো নেই। শুধু কতগুলো বড় বড় সিঁড়ি নেমে গেছে নদীর জলে। তবে সেখান থেকে গঙ্গা নদী বড় সুন্দর লাগছিল। আমাদের খুব ইচ্ছে হল একটা নৌকা নিয়ে আমরা কিছুটা সময় গঙ্গাবক্ষে ঘুরে বেড়াব! কিন্তু সেদিন ঘাটে একটাও নৌকা নেই। তখন ওখানে লোকজনও তেমন ছিল না। আমরা ঘাটে পৌঁছনোর পরই আমাদের একেবারে নাকের ডগা দিয়ে ওখানকার শেষ নৌকাটি কয়েক জন যাত্রী নিয়ে ছেড়ে দিল। আমরা লাইন দিয়ে সিড়িতে দাঁড়িয়ে হতাশ দৃষ্টিতে নৌকাটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম!

সাত-আট জনের যে দলটা নৌকা ভাড়া নিয়েছিল, তারা সকলেই ছিল অল্পবয়সী যুবক। আমাদের ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারা নৌকা থেকেই চেঁচিয়ে বলল – "এখন আর কোনো নৌকা পাবেন না। যদি চান তো আমাদের এই নৌকায় আপনারা আসতে পারেন। আমাদের কোনো অসুবিধা নেই !"

এরকম একটা প্রস্তাব পেয়ে আমরা আবার চনমনে হয়ে উঠলাম। সবাই এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছি। যাবার ইচ্ছে ষোল আনা! কিন্তু অজানা অচেনা লোকেদের সাথে এভাবে এক নৌকায় যাওয়াটা ঠিক হবে কি না বুঝে পাচ্ছি না ! শেষ পর্যন্ত নিজেরাই বলাবলি করলাম – "দিনের বেলায় খোলা নৌকাতে চড়ে গঙ্গায় একটু ঘুরব। কি আর হবে ?"

অতএব যাওয়াটাই ঠিক হল ! ভেসে যাওয়া নৌকা আবার তীরে এসে ভিড়ল। আমরা নৌকায় উঠলাম। ছেলেগুলো আমাদের সাথে অনেক গল্প করছিল। কি গল্প – সেটা এখন মনে নেই। তবে এখন মনে করলে বুঝতে পারি ছেলেগুলো সত্যিই খুব ভদ্র ছিল। আমরা নৌকায় বেড়ানোর সময় গান গাইলাম। মনে আছে, ওই দলের একজন খুব ভালো আবৃত্তি করেছিল। ঘুরে ফিরে আবার ঘাটে নেমে যখন বিদায় নিচ্ছি, তখন ছেলেদের মধ্যে থেকে একজন বলল – "আমরা এতক্ষণ একসাথে বেড়ালাম, কিন্তু কেউ কারো নাম জানলাম না ! এখন অন্তত পরিচয়টা হয়ে যাক !"

কিন্তু তখন একজন বলে উঠল – "থাক না। নাম না হয় না জানাই রইল – একটা অসমাপ্ত কবিতার মত!" ... এই কথার পর কেন জানি না আমরা কেউই কিছু বললাম না ! শুধু যে পরিচয় চাইছিল, সে বলল – "তবে তাই হোক ! আমাদের এই নৌকা ভ্রমণ একটা অসমাপ্ত কবিতা হয়েই মনে থেকে যাক !"

আমার গল্প শেষ হতেই চিত্রাদি বলল – "বেশ রোমান্টিক ! তবে রোমান্সটা হতে হতেও হল না !"

সুনন্দাদি বলল – "সত্যি, আমিও খালি ভাবছিলাম, এইবার একটা কিছু হবে! একটা প্রেম-টেম কিছুর আভাস পাব ! কিন্তু" ...

চিত্রাদি এবার তাপসীকে ধরল – "এবার তাপসী, তুমি একটা নৌকা বিহারের গল্প বল।"

তাপসী ওর স্বভাবসিদ্ধ হাসি দিয়ে বলল – "আমি আবার কি বলব ?"

– "কেন ? তুমি কখনও নৌকায় চড়নি ?"

– "তা চড়েছি। ছোট বেলায় বেলুড়-দক্ষিণেশ্বর নৌকায় পারাপার করেছি !"

– "আর বড় বেলায় ?" চিত্রাদি নাছোড়বান্দা।

– "বিয়ের পর নৈনিতাল বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখন নৌকায় চড়ে ওখানে লেকে ঘুরেছি।"

– "তবে? এবার পথে এসো। তুমি তো তাহলে বরের সঙ্গে রীতিমত নৌকা-বিহার করেছ !"

– "বল, বল, তখন নৌকায় কি রকম প্রেম করেছিলে ? কটা চুমু খেয়েছিলে ?"

তাপসী লাজুক হেসে বলল – "চিত্রাদি, কি যে বল !"

সুনন্দাদি আমাদের থামিয়ে দিল – "তোমরা আর তাপসীর পিছন লেগো না তো ! ও বেচারা ভীষণ লজ্জা পাচ্ছে ! ওকে ওর মত করে বলতে দাও !"

তাপসী এবার একেবারে ওর নিজস্ব স্টাইলে বলতে শুরু করল – "কি বলি, বল তো ! গল্প তো কিছু নেই। আসলে, বিয়ের ঠিক পরেই আমরা নৈনিতাল বেড়াতে গিয়েছিলাম ! বলতে পার, হানিমুনে গিয়েছিলাম ! নৈনিতাল তো খুবই সুন্দর জায়গা ! তোমরা সবাই জানো। ওখানকার ওই বিরাট লেকে সারাদিনই অনেক লোক নৌকা চড়ে ঘুরে বেড়ায় ! আমরাও একদিন ওখানে নৌকা-বিহারে গেলাম। আমি প্রথমে রাজী হইনি ! খুব ভয় পাচ্ছিলাম। একে তো সাঁতার জানি না, তার উপর শুনেছি ওখানে নৌকা ডুবি হয়ে অনেক লোক মারা গেছে ! কিন্তু, আমার বর সেসব হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলল – "দূর্ ! অত ভয়ের কিছু নেই ! নৈনিতালে এসে বোটিং না করলে লোকে কি বলবে ? আর তুমি সাঁতার জান না তো কি হয়েছে ? আমি তো জানি – বোট উল্টোলে আমি ঠিক তোমায় বাঁচিয়ে নেব !"

যা হোক, নৌকায় তো উঠলাম। শুধু দুজনেই ছিলাম নৌকাটাতে ! একেবারে জড়োসড়ো হয়ে সীটের এক কোণে বসেছিলাম ! ও আমাকে বলল – একি, এ রকম জড়োসড়ো হয়ে বসে আছ কেন ? ভয়ের কিছু নেই। রিলাক্স, এদিকে এসো ! এই বলেই ও আমার হাত ধরে টান দিল ! আর সেই সঙ্গে বোটটা জোরে দুলে উঠল ! আমি ভয় পেয়ে ওকে একেবারে জাপ্‌টে ধরলাম ! "ও তো মজা পেয়ে খুব হাসছে। আর আমি একেবারে লজ্জায় মরি !"

তাপসীর চোখে মুখে লজ্জারুণ হাসি! – সূর্যাস্তের আলোর ছটায় ওকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল ! সুনন্দাদি বলল – "আহা, কি মধুর সে দৃশ্য ! মনস্‌চক্ষে সব যেন দেখতে পাচ্ছি !"

লেকের জলে রেসর্টের আলোর প্রতিবিম্ব কাঁপছে। শ্যামা এখনও ব্রীজের ওপাশে দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলছে। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে ও আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। তাপসী বলল – "হ্যাঁ গো সুনন্দাদি, শ্যামার কি কেউ আছে ? মানে কোনো প্রেমিক বা বয়ফ্রেন্ড ? এতক্ষণ ধরে কথা বলছে !"

সুনন্দাদি মাথা নাড়ল – "হ্যাঁ, আছে ! কিন্তু সেখানেও ঝামেলা ! ওর ছেলে তাকে একদম পছন্দ করে না।"

আমি বললাম – "শ্যামার গল্প এখন থাক। এবার আমরা সুনন্দাদির নৌকা বিহারের রোমান্টিক গল্প শুনবো !"

"কিন্তু আমার তো নৌকা ভ্রমণের কোনো রোমান্টিক গল্প নেই ! যেটা আছে, সেটা কি বলব, একটা বিশ্রী অভিজ্ঞতা ! ওটা এখন বলব না। কারণ, ওটা শুনলে তোমাদের সবার মন খারাপ হয়ে যাবে। এখনকার সুন্দর এই আনন্দের পরিবেশটা নষ্ট হয়ে যাবে।"

আমরা সবাই বললাম – "না তা হবে না। জীবনে ভালো মন্দ সবই আছে। সেটা আমরা সবাই জানি। তুমি বল। তোমার সেই বিশ্রী অভিজ্ঞতা আমরা শেয়ার করতে চাই। আর মন খারাপের কি আছে ? ওটা তো অনেক কাল আগে ঘটে গেছে ! তুমি বল।"

সুনন্দাদি তার ধীর শান্ত গলায় বলতে শুরু করল:

আমার তখন এম এ ফাইনাল ইয়ার। আমার পিসি থাকত ব্যারাকপুরে। ওটাই ছিল পিসীর শ্বশুরবাড়ি। ওনাদের একান্নবর্তী পরিবার। পিসীর দুই দেওর, তাদের স্ত্রী ছেলে মেয়ে, আরো কে কে সব থাকত সেখানে। একবার ওনাদের একটা অনুষ্ঠানে আমি পিসীর বাড়িতে গিয়ে ক'দিন ছিলাম।

ওদের বাড়ির অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবার পরদিন রনুকাকু, মানে আমার পিসীর ছোট দেওর বলল – "চল সুনন্দা, আজ তোমাকে গান্ধী ঘাট দেখিয়ে আনি।"

পিসী বলল – "সেই ভালো, সুনু ! যা, আজ গান্ধী ঘাটে ঘুরে আয়। এসে থেকে তো সেই ঘরেই বসে আছিস !"

বিকেলের দিকে রনুকাকুর সাথে গান্ধীঘাটে গেলাম। ঘুরে ফিরে সব দেখলাম। আরও অনেক লোকজন ছিল সেখানে। ঘাটে কয়েকটা নৌকা ছিল। কেউ কেউ নৌকা ভাড়া নিচ্ছিল। আমার সামনে একজন নৌকার মাঝিকে বলল – "শ্রীরামপুরে যাব। কত নেবে ?"

আমি রনুকাকুকে বললাম – "আচ্ছা ! এই নৌকাগুলো যাত্রীদের নিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌঁছে দিচ্ছে ?"

রনুকাকু উত্তর দিল – "হ্যাঁ, সেটা করছে। তবে এই নৌকা ভাড়া করে নদীর উপর শুধুমাত্র বেড়ানোও যায় ! চল, আমরাও একটু নদীতে বেড়িয়ে আসি।" বলতে বলতেই রনুকাকু একটা নৌকা ডাকল। আমি একবার আপত্তি জানালাম – "ছেড়ে দাও, রনুকাকু ! এখন আর নদীতে বেড়িয়ে কাজ নেই। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। অসুখ বিসুখ করলে মুস্কিলে পড়ব।"

রনুকাকু শুনল না। বলল – "দূর ! অসুখে পড়বে কেন ? ছোট্ট একটা চক্কর কেটে ফিরে আসব। কিছু হবে না।"

নৌকায় উঠে আমি ছইয়ের বাইরে বসতে যাচ্ছিলাম। রনুকাকু বাধা দিয়ে বলল, "ওখানে বোসো না। ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে অসুখ করতে পারে। ভিতরে এসে বোসো।"

আমি কথাটার যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে ভিতরে গিয়ে বসলাম। নৌকা চলতে শুরু করেছে। আমি ছইয়ের ভেতরে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি। বহমান নদী, আশপাশের দৃশ্য, আকাশের ভাসমান মেঘ, নৌকোর দোল, সব মিলিয়ে বেশ ভালোই লাগছিল। হঠাৎ আমার দুই কাঁধে হাত দিয়ে রনুকাকু বলল – "এত আড়ষ্ট হয়ে বসে আছ কেন ? একটু আরাম করে বোসো।" বলতে বলতেই এমন টান দিল যে আমি টাল সামলাতে না পেরে ওর গায়ের উপর পড়ে গেলাম ! আর লোকটাও সঙ্গে সঙ্গে আমাকে একেবারে বিশ্রীভাবে জড়িয়ে ধরে মুখটা নামিয়ে আনল। আমি এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে দিলাম। তবু ছাড়ে না আমায়। আবার নির্লজ্জের মত বারবার বলছে "এরকম করছ কেন ? কিছু হবে না।"

আমি কোনো রকমে লোকটার হাত ছাড়িয়ে ছিটকে বাইরে চলে এলাম। আমি তখন রাগে, বিতৃষ্ণায়, অপমানে, ফুঁসছি! মাঝি বসে আছে ছইয়ের ওপারে। এপাশ থেকেই আমি চেঁচিয়ে বললাম, "মাঝিভাই, নৌকা এবার ফিরিয়ে নাও।"

মাঝি অবাক হয়ে বলল – "নদীতে আর ঘুরবেন না ?"

আমি জোর দিয়ে বললাম – "না। এবার বাড়ি ফিরব।"

ফিরবার পথে আমি আর একটা কথাও বলিনি। রনুকাকু একবার শুধু বলেছিল – "আই অ্যাম সরি !" আমি সেকথারও কোনো উত্তর দিইনি।

তাপসী বলল – "তুমি বাড়ি গিয়ে কারোকে কিছু বলনি ?"

সুনন্দাদি মাথা নাড়ল – "না !"

চিত্রাদি বলল – "বলা উচিত ছিল। লোকটার মুখোশ খুলে যেত।"

সুনন্দাদি একটু হাসল। মাথা নেড়ে বলল – "হয় তো উচিত ছিল। কিন্তু আমি পারিনি। আসলে সময়টা তখন অন্য রকম ছিল! সমাজটাও! তা ছাড়া রনুকাকুর স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, তাদের কথাও মনে হল। তবে ওখানে আর থাকিনি। সেদিন রাতেই কলকাতায় ফিরে এলাম। পিসী অবশ্য একটু দুঃখ পেয়েছিল। অবাক হয়ে বলল – "সেকি রে, কাল সকালে যাবি বলেছিলি। আর এখন রাতে বেড়িয়ে যাচ্ছিস ?"

আমি বললাম – "আসলে মনে পড়ে গেল, কাল সকালে একটা ইম্পর্ট্যান্ট ক্লাস আছে। এখন রাত কোথায়? সবে তো সন্ধ্যা! আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে পৌঁছে যাব। চিন্তা কোরো না। পৌঁছে খবর দেবো। সেই যে বেড়িয়ে এসেছিলাম, আর কোনো দিন আমি ওই বাড়িতে যাইনি !"

সুনন্দাদির গল্প শেষ হবার আগেই শ্যামা আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। এখন গল্প শেষ হতেই বলল – "তোমরা ঘরে যাবে না ? রাত্তির হয়ে গেছে তো !"

আমি বললাম – "দাঁড়া, দাঁড়া ! আর পাঁচ মিনিট। চিত্রাদির গল্পটা শুনে তারপর ঘরে যাব।"

চিত্রাদি সঙ্গে সঙ্গে বলল – "আমার গল্পও শুনবে ? বেশ, আমি তবে আমার ছোটবেলার একটা নৌকা যাত্রার দারুণ গল্প শোনাবো তোমাদের !"

(চলবে)

রমা জোয়ারদার – দিল্লীর বাংলা সাহিত্য মহলে একটি পরিচিত নাম। গত কুড়ি বছর ধরে দিল্লী, পশ্চিমবাংলা ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্প, প্রবন্ধ, রম্য রচনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বিজ্ঞানের ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। প্রকাশিত ছোট গল্প সংকলনঃ (১) রোজ নামচার ছেঁড়াপাতা; (২) সবুজ ঢেউ আর ঝাপসা চাঁদ।

ময়ূরী মিত্র

চাঁদমৃত্তিকা

পর্ব – ১

রাম আপদ ! এই যা না নিজেদের ডেরায় । মা তো একটা আছে নাকি ? নাকি ফেলে অন্য ছেলের সঙ্গে পালিয়েছে রে ! – বলতে বলতে আগুন হয়ে উঠলেন ইন্দ্রজিত । পৃথিবীতে নামতে না নামতে এই দুইটা নোংরা ছেলে বাবা বাবা বলে ঘাড়ে এসে পড়ল । কতদিন পরে রাণী আর পোষা অপ্সরা নিয়ে ধরিত্রীর শস্যক্ষেত্র দেখতে এসেছেন ইন্দ্র । সবই তো তাঁর ! দেখাশোনার অভাবে ফসল না হাতছাড়া হয়ে যায় – এই ভয়টা তৈরী হচ্ছিল কমাস ধরে ! আগে নিজের সম্পদ নিয়ে এত ভয় ছিল না ইন্দ্রের । আসলে তখন ভরা পুকুরের মতো রসময় যৌবন ছিল তাঁর । প্রায়ই নেমে আসতেন পৃথিবীতে । শস্য ও নারী দুইকেই ভোগ করতে পারতেন তুমুল । ভোগ জানলে হারাবার ভয় থাকে না - এমন সত্যই দেবপিতারা তাঁকে শিখিয়েছিলেন । পাকা গমের ক্ষেতে কত কৃষকরমণী যে আনন্দ দিয়েছে তাঁকে ! এদের শরীরের দুয়োর ঢেউয়ের মতো । চামড়ার শ্যাওলা রঙ ... সাপের মতো বেণী আজো জেগে আছে ইন্দ্রের শরীরে । কেন জানি – দেবকন্যা ও অপ্সরাদের মিলনের ইচ্ছে ইন্দ্রর ভালো লাগত না । অনিচ্ছুক মানব রমণীকে আপন শরীরমহিমায় মাতাল করে দিতে কী যে ভালো লাগত ! – দুপুরবেলা পাহাড়ী গ্রামের ক্ষেতের ধারে বসে এইসব যখন ভাবছেন ইন্দ্র ছেলে দুটো এল আর ফট করে বাবা ডেকে দিল । ইস ! কোত্থেকে এল এরা ! মানুষের বউগুলোর এত সাহস বাচ্চাগুলোকে বাবা বলার জন্য তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিল ! বাচ্চাদুটোর মা জানে না, বুড়ো বয়সে রাণী অপ্সরাদের কাঁধে ভর দিয়ে ছাড়া ইন্দ্র আর পৃথিবীতে নামতে পারেন না ! দেখো দিকি – রাণী আর ওই অপ্সরাগুলো কেমন নোংরা করে হাসছে ছেলে দুটোর বাবা ডাক শুনে ! সামান্য বিব্রত বোধ করলেন ইন্দ্র ! আর কী নোংরা জামাকাপড় এদের ! বাপ রে বাপ ! জন্মে কাচে না নাকি ! ধেড়ে দামরা ছেলে ! অথচ মুখ নিয়ে অবিরত নাল ঝরছে ! ত ত করে কথা বলছে !

ওমাগ ! আবার শিকনি শুকিয়ে নাকের দুপাশে দাগ হয়ে রয়েছে । রাগের মধ্যেও একটু অবাক হলেন ইন্দ্র । আজ অব্দি যত কৃষকবধূর যোনি নিয়েছেন তিনি সবার স্বামীকে খেত, বাড়ি, গাই, পুকুর সব দিয়েছেন যাতে তাঁর পৃথিবীবাসী ছেলেমেয়েগুলোও হৃষ্টপুষ্ট হয় । যাতে শিশুর পুষ্টি দেখে বুঝতে পারেন কোনটি তাঁর ও কোনটি কৃষকের । পৃথিবীতে বাস হলেও তারা দেবপুত্র তো বটে ! মানুষের সন্তানের সঙ্গে শরীরের কান্তিতে একটু তফাৎ তো থাকবেই ! পৃথিবীতে আজ অব্দি যত রমণী ভোগ করেছেন, সবাইকে কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন – গর্ভে সন্তান এলে তার ভরণপোষণ ইন্দ্রের অর্থে হবে । প্রতিবছর ইন্দ্রর দূতরা দেখেও যেত – তাঁর সন্তানেরা সাধারণ কৃষকসন্তানদের তুলনায় সমৃদ্ধিতে বড় হচ্ছে । বেশী মেধাযুক্তও তো হচ্ছে তারা ! ঠিক ছিল – এইসব সন্তানকে নগরে নিয়ে গিয়ে আবাস ও চাকরি দেবেন । কৃষিকাজে আর কী বা মেধা লাগে ! – দুপুরের ঝলকানো রোদে পাহাড়ী ক্ষেত্র দেখতে দেখতে আবার অন্যমনস্ক হলেন ইন্দ্র ! ভেবে পেলেন না – কোন রমণীর এত স্পর্ধা যে সাধারণভাবে ইন্দ্রর সন্তানকে মানুষ করতে গিয়ে এমন হাবা কালা বানিয়ে তুলেছে । ছেলে দুটোর লজ্জা নেই ! ফের ডাকল – বাবা । অপ্সরাদের হাসি উচ্চকিত হল । গ্রাহ্য না করে ছেলে দুটো বললে –

ও বাবা । এস আমাদের সঙ্গে । মা বলে দিয়েছে – কতদিন বাদে তোমাদের বাবা আজ পৃথিবীতে এসেছেন! যাও বাবাকে প্রণাম করে আমাদের সুন্দর গ্রামখানি ঘুরিয়ে দেখাও । এ গ্রামের কৃষিক্ষেত্র তাঁর দেওয়া । দেখার হক তাঁর আছে । এস বাবা । আর দেরী কোর না । সময় বেশী নেই । রাতে এখানে খুব হাতী বেরোয় । তখন কৃষকরা তাদের মাচাঘরে উঠে পড়ে । তোমার সঙ্গে তখন তারা আলাপ করতে পারবে না ।

কথা শুনে ভারী অবাক হলেন। ছেলেদুটোকে তত হাবা মনে হচ্ছে না। কাছে এসে ছেলে দুটোর মুখের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন ইন্দ্র। দেখলেন – ছেলেদুটোর জিভের গঠন ঠিক নেই। তাই হয়ত অস্পষ্ট উচ্চারণ। কিন্তু কী আশ্চর্য ! কথা বলছে কিন্তু প্রতি শব্দের মানে বুঝে। চকলেট বোমার মতো ফেটে পড়লেন দেবতা ইন্দ্র – এই বদমাশ দুটো ! এই উল্লুক দুটো তোদের মা কে ? এক্ষুনি নিয়ে চল আমায় ! এতবড় সাহস আমার সন্তানকে এত দারির্দ্রে মানুষ করছে ! বল শিগগির কে তোদের মা ? কেন সে তার প্রাপ্য সম্পত্তি আমার থেকে চেয়ে নেয় নি ? বল শালা। তোদের পালক বাপের নাম !

ইন্দ্রের ঝাঁকানিতে ছেলেদুটোর রুগ্ন দুটো জিভ বেরিয়ে এসেছে। হাঁফাচ্ছে ধুলোমাখা দুই সন্তান। তবু উত্তর নেই। জিভ দাঁত বেরিয়ে তাদের মুখ দুটো কেবল হাসিমাখা দেখাল। ইন্দ্র শক্ত করে তাদের হাত ধরে এগোলেন গ্রামের দিকে।

পর্ব – ২

রাত গভীর। আকাশ ভরে নক্ষত্র, চাঁদ। ক্লান্ত ইন্দ্র। সারাদিন ধরে বোকা বনেছেন নিজের ছেলেদের কাছে। তারা তাদের বাবাকে গ্রামের প্রতিটা বাড়ি নিয়ে গিয়েছে। আলাপ করিয়েছে প্রতিটি স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে। কিন্তু কিছুতে দেখায়নি তাদের মাকে। প্রতি বাড়ির সামনে গিয়ে কাতর অনুরোধ করেছেন ইন্দ্র – এই বাড়িতে কি ... ? বল বাপ ... এই বাড়ির বউ কি তোদের মা ? আমি কাউকে বলব না। তোদের আর বকব না। তোদের মাকেও বকব না। শুধু দেখিয়ে দে কে তোদের মা ? আমি তাকে কিছু ধন দিয়ে যাব। তোরা বড় হবি। মানুষ হবি। নগরে গিয়ে চাকরি করবি।

নাহ ! কিছুতেই লোভী হল না ছেলে দুটো। শুধু দোকান থেকে যখন জুতো কিনে দিতে চাইলেন, তারা বললে – পায়ে কুটকুট করবে।

এরপর থেকেই ইন্দ্র তাদের মাকে দেখার আশা ছেড়েছেন। একটু পরেই চাঁদ আলো বাড়াবে। রাণী আর অপ্সরাদের নিয়ে তিনি ফিরবেন আকাশে। ছেলে দুটো একবার এলে পারত।

হঠাৎ দূরে একপাল হাতী ডাকল। মাচায় পাহারাঘরে আলোড়ন দেখা দিল। চাষীরা ক্যান, টিন পেটাচ্ছে। একী ! হাতীগুলো সব খেয়ে ফেলবে যে ! যত না খাবে তার থেকে ছড়াবে বেশী। বড় বড় লতাগুলো স্রেফ দুমড়ে ফেলবে।

বাঁচাতেই হবে ক্ষেতখামার। এ সব তাঁর দান। তাঁর দায় বেশী। ইন্দ্র অস্ত্র তুললেন। প্রথম পা ফেলতে গিয়েই ইন্দ্র দেখলেন তাঁর পা মাটিতে আটকে গেছে। এমন করে মাটি তাঁকে আটকাচ্ছে কেন ! তিনি তো মাটির ধন বাঁচাতেই যাচ্ছেন। কিছুতেই পা আর ছাড়াতে পারছেন না তিনি।

ঘোড়ার বেগে লাফালেন ইন্দ্র। যে জায়গায় লাফ সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে পা দিয়ে মাটি পিষতে পিষতে হিসহিসে গলায় বললেন –

ছাড় আমায় শয়তানী ! মাটি আমি দেবতা। আমি আছি বলে তুই ধরিত্রী হয়ে আছিস। ছাড় আমায়। দেখতে পাচ্চিস না হাতী তোকে খেয়ে নিচ্ছে !

মাটি অল্প হাসলে। চাঁদের আলোয় কি সে হাসি দেখতে পেলেন ইন্দ্র ! শুধু একটি মৃদু গলা শুনলেন –

আমি আছি বলে তুমি দেবতা ! আমি আছি বলে ওই ছেলেদুটো ...

ইন্দ্র দেখলেন চাঁদ প্রখর হয়েছে। একটি হাতীর পিঠে দুটো ছেলে। বাকীরা পাশে চুপচাপ, নিজেদের যতটুকু আহার্য দরকার ততটুকুই খাচ্ছে। মাটির মাঝে জীবের খাদ্যগ্রহণের শব্দ।

রাণী তাঁর বরের হাত ধরলেন।

এতদিন পরে বর তাঁর পাপহীন হয়েছে।

আজ থেকে বুড়োবুড়ির হাসিমুখে স্বর্গবাসের শুরু।

ফসল বাঁচাবার উঁচু ঘরগুলোয় প্রতিফলিত হচ্ছে চাঁদ।

সে প্রতিফলনে লক্ষ চাঁদ।

মাটির চোখ বেশী দেখে।

পর্ব – ৩

সকালে অজয় আর বিজয় তার মাকে হাতীর ফসল খাওয়ার গল্প বলছিল –

– জানো মা হাতীগুলো অল্প একটু ফসল পেতে ঠাণ্ডা হয়ে গেল গো ! সত্যি বলছি মা ! তোমরা বাপু মিছে ভয় পাও হাতীগুলোকে।

পাহাড় অঞ্চলে সন্ধে নামতেই জব্বর ঠাণ্ডা। হিরণ্ময়ী ছেলেদের পায়ের আঙুলের ফাঁকে চার্মিস ক্রিম দিয়ে দিলেন।

হিরণ্ময়ীর পায়েও অনেক আগে মাটি লেগেছিল। সে তাঁর দেশের মাটি। এখন এ পরদেশ। হিরণ্ময়ী হেসে দিলেন একগাল। মানুষ হাতী সব্বাইকে প্রয়োজনে মাটি বদল করতে হয়। বলতে গিয়েও চুপ থাকলেন হিরণ্ময়ী। চার্মিসের সঙ্গে মাটি উঠে এল খানিক। হিরণ্ময়ীর মনে পড়ল – তাঁর এদেশের বর যেরাতে ছেলেদুটোর পেটে আসার খবর পেল ফিসফিস করে শুধু বলেছিল -তোমার দুধের আলো যেন চাঁদের থেকে বেশী হয়। হিরণ তুমি আমার কালোচন্দ্র .....। মাঝে মাঝে এসব মনে করে এখনো যৌবন পরীক্ষা করেন অজয় বিজয়ের মা।

ময়ূরী মিত্র – বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষক, সাহিত্যিক, নাট্যশিল্পী। পড়াশুনো : কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ইতিহাসে মাস্টার্স এবং বিশেষ শিশুদের প্রশিক্ষণের জন্য বি এড। তারপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড, পবিত্র সরকারের কাছে গবেষণা। বিষয় : ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি বুদ্ধিজীবীর রাজনৈতিক উত্তরণ ও নাটকে রাজনীতি চর্চা। সম্প্রতি একুশ শতক প্রকাশনা সংস্থা এ বিষয়ে লেখকের গ্রন্থপ্রকাশ করেছেন। বইয়ের নাম – মহাবিদ্রোহের পরে নাটকের চোখে। ময়ূরী মানুষকে দেখেন এবং মানুষে মানুষ খুঁজে বেড়ান আর খুঁজে পেলে খুশী হন। সে মানুষেরাই উঠে আসে তার লেখায়।

ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায়

ছায়া সীমানা

পর্ব ৬

(১১)

একটু পরেই পবিত্র আর বিজয়া এসে পড়বে। রাতে ওদের খাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন গৌরী।

শ্রীতমার সঙ্গে দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠতার ফলে কখন যেন ওরাও গৌরীর ছেলেমেয়ে হয়ে গিয়েছিল এক সময়ে। এখন শ্রী তার স্বামীর ঘরে চলে যেতে, পবিত্র আর বিজয়া ওঁকে ফোন করে প্রায়ই। চেষ্টা করে ওঁর শূন্যতা খানিকটা অন্ততঃ কাটাতে। ওরা অনেক সময়ে বায়না করে ফোনে, "মাসীমা, কবে আমরা আপনার হাতের লুচি-আলুর দম খাব"? অথবা "মাসীমা, কষা মাংস আর ঘী ভাত খেতে আসছি তো এই উইকেন্ডে"? অথবা "আজ এই মুষলধারা বৃষ্টির রাতে মুগের ডালের খিচুড়ি, ডিমের বড়া আর আলু-পেঁয়াজ ভাজা কেমন জমবে, ভাবুন। আসছি আমরা। তিনজনে মিলে হাত লাগাব"।

ওদের এই আন্তরিকতা ভারি ভাল লাগে গৌরীর।

বিকেলবেলা কাজ থেকে ফিরে এসে এক কাপ গরম চা নিয়ে বসেছিলেন গৌরী। ক্লান্তি কাটিয়ে রান্নায় হাত দেবেন খানিক পরে।

ডোরবেলের আওয়াজ শুনে উঠে গিয়ে দরজা খুলে খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন। পবিত্র আর বিজয়া নয়, ওঁর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে শ্রীতমা। পাশেই মেঝেতে ঢাউস একটা সুটকেস রাখা। এ ছাড়াও, মস্ত একটা ব্যাগ-ভর্ত্তি জিনিসপত্র। শ্রীতমার কাঁধেও ঝুলছে বড়সড় একটা হ্যান্ডব্যাগ।

– একি! তুই হঠাৎ? এত মালপত্র নিয়ে? সঞ্জয় আসে নি?

– "ভেতরে ঢুকতে পারি"? ঠান্ডা গলায় বলল মেয়ে।

– "আয়, আয়", অপ্রস্তুত হয়ে দরজা থেকে সরে শ্রীতমাকে পথ ছেড়ে দিলেন তিনি।

সুটকেশ এবং অন্যান্য জিনিসপত্র তুলে নিয়ে শান্তভাবে নিজের ঘরে ঢুকে গেল শ্রীতমা।

একটু পরে বেরিয়ে এসে মাকে বলল, "আমি এক কাপ গরম চা পেতে পারি"?

গৌরী তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে উঠে গেলেন চায়ের জল চাপাতে।

তখনি আবার ডোর বেলটা বেজে উঠল। এবার শ্রীতমা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। ওর সামনে দাঁড়িয়ে পবিত্র আর বিজয়া। বিজয়ার হাতে ধরা একটা মিষ্টির প্যাকেট।

বিস্মিত শ্রীতমা বলল, "আরে তোরা! হঠাৎ? কি ব্যাপার"?

– "তুই এখানে কি করছিস"? বিজয়া কলকলিয়ে উঠল, "বলিস নি তো যে তুই আজ আসছিস! আর সঞ্জয়দাই বা কোথায়"?

গৌরী ততক্ষণে রান্নাঘর থেকে শ্রীতমার জন্য চা নিয়ে বেরিয়ে এসে বললেন, "এসো গো, ছেলেমেয়ে। তোমাদের বন্ধুও দেখি বিনা নোটিসে এসে পড়েছে, বর ছাড়াই! যাক্ ভালই হ'ল। সকলে এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করবে'খন। কিন্তু আমার জামাইটা কেন এলো না, শ্রী"?

– "তার কাজের চাপ অত্যন্ত বেশী আজকাল", শ্রীতমা সহজ গলায় বলল, "আর এদিকে আমার ফাইনাল পরীক্ষাও একেবারে দোরগোড়ায়। তাই আমিই তল্পি-তল্পা গুটিয়ে নিয়ে তোমার কাছে চলে এলাম। এখানে বসে নির্বিঘ্নে পড়াশোনাটা করব। আর হ্যাঁ, পরীক্ষাও এখান থেকেই দেব, মা"।

– "তল্পি-তল্পা গুটিয়ে! এখান থেকেই পরীক্ষা দিবি ?" ওর দিকে ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল পবিত্র।

– হ্যাঁ, তো? এনি প্রব্লেম? আমি কি চিরটা কাল এখান থেকেই পরীক্ষা দিই নি?

– "আহ্, বিরক্ত হচ্ছিস কেন"? বিজয়া মধ্যস্থতা করল, "চিরকাল তোর নিজের বাড়ি ছিল না, তাই মায়ের বাড়িতে ছিলি। এখন তো হয়েছে। সেই জন্যই তো পবিত্র বলছিল ---"

– "থাক্"! হঠাৎ হাত তুলে বিজয়াকে থামিয়ে দিল শ্রীতমা। বলল, "এই কটা মাসেই স্বামীর ঘর আমার আপন হয়ে গেল! আর জন্মাবধি যে বাড়িতে থেকেছি, সে বাড়ি আমার নিজের নয়! এমন অদ্ভুত কথা কোনকালে শুনি নি"।

– "আচ্ছা মা, ঠিক আছে," গৌরী ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, "এখানেই থেকে তুই লেখাপড়া কর। এখান থেকেই পরীক্ষাও দিস'খন। কোন সমস্যা নেই"।

ওদের বসিয়ে গৌরী আবার রান্নাঘরে ঢুকলেন। রান্নার যোগাড় আগেই করে রেখেছিলেন। এবার চাপিয়ে দেবেন।

বসার ঘরে ফোনটা বেজে উঠল হঠাৎ।

– "কে আবার এখন! এই অসময়ে," বলতে বলতে শ্রীতমা উঠে গিয়ে ফোন ধরে বলল, "হ্যালো ----"

ওপারে সঞ্জয়ের উদ্বিগ্ন গলা, "এ কি শ্রী, তুমি ওখানে কি করছ ? বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ মায়ের ওখানে চলে গেলে তুমি! আমাকে একবার বলে যাবারও প্রয়োজন মনে করলে না"!

– "তো?" শ্রীতমা শান্ত, সহজ গলায় বলল।

– তো! আমার যে কি চিন্তা হচ্ছিল! তুমি কি বোঝ না!

– না, আমি বুঝি না। এখানেই আমি থাকব এখন থেকে। পরীক্ষাও দেব এখান থেকেই।

– "কেন, শ্রী? তোমার নিজের বাড়ি ছেড়ে, তুমি . . . ."

– এটাই আমার নিজের বাড়ি।

– এ কি বলছ তুমি! আমাদের এই বাড়িটা তোমার নয়? তোমার আমার বাড়ি নয়?

– "এখন আমার বন্ধুদের সঙ্গে ব্যস্ত আছি। রাখলাম"। শ্রীতমা লাইন কেটে দিয়ে বন্ধুদের কাছে ফিরে এসে বসল।

– "কে ফোন করেছিল রে", টেবিলে খাবার রাখতে রাখতে গৌরী জিজ্ঞেস করলেন মেয়েকে।

– "কে একজন উট্‌কো লোক। রং নম্বর", ঘাড় ঝাঁকিয়ে শ্রীতমা উত্তর দিল।

তেহ্‌রী, বেগুন ভাজা, কষা মাংস এবং সোয়া-পালক-বেগুন রান্না করেছিলেন গৌরী। অতুলনীয় সেই রান্নার স্বাদ। অপূর্ব গন্ধ।

ছেলেমেয়েরা খুব আনন্দ করে খেল বটে, কিন্তু তৃপ্ত হলেন না। সঞ্জয়ের অনুপস্থিতি তাঁকে বিঁধতে থাকল সারাটাক্ষণ! অথচ তাকে যে একবার ফোন করে চলে আসতে বলবেন, সে ভরসাটুকুও পেলেন না, মেয়ের থম্‌থমে চেহারা দেখে!

খাওয়া-দাওয়ার পর চা করল বিজয়া। তারপর নিজের কাশীর বিখ্যাত মালাই রোটি পরিবেশন করল চায়ের সঙ্গে। মালাই রোলও কিনেছিল পবিত্র'র কথা ভেবে। মিশ্রিত ক্ষীর এবং মালাইয়ের মোড়কে পেস্তা-বাদামের পুর দেওয়া এই মিষ্টি ভারি পছন্দ পবিত্র'র, অথচ দামের কথা মাথায় রেখে নিজে কিনতে চায় না কখনো! শুধু তাই নয়, মিষ্টির দোকানে পবিত্র'র সঙ্গে গেলে কিছুতেই মলাই রোটি কেনার উপায় নেই বিজয়ার।

পবিত্র আর বিজয়া যখন শ্রীতমাদের বাড়ি থেকে বেরোল, রাত তখন সাড়ে দশটা।

ফেব্রুয়ারী মাস। বসন্তকালের সূচনা হাওয়ায়। কবিরা যাকে বলেন মলয় সমীরণ!

– "ঈশ্, নাকের ডগায় পরীক্ষাটা না থাকলে, কোথাও বেড়াতে যেতে পারতাম এখন। জাস্ট ফর আ ড্রাইভ"! গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে অনেকটা আপন মনেই বলল বিজয়া। পবিত্র'র কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে, মিনিট খানেক পরে সে আবার বলল, "আচ্ছা, কি মনে হ'ল তোর"?

– কিসের কি মনে হ'ল?

– আমাদের শ্রীতমা দেবীর কথা বলছি।

– "কি আর মনে হবে"! পবিত্র সংক্ষেপে উত্তর দিল।

– সে হঠাৎ, আমাদের বলা নেই, কওয়া নেই, নিজের সংসার ছেড়ে মায়ের কাছে এসে উঠল! অদ্ভুত ব্যাপার!

কিছুদিন আগে, মানস চক্ষে দেখা দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল পবিত্র'র। অতীব লাস্যময়ী এক নারী। মোহিনী সেই নারী, নাগিনী-কন্যার ভঙ্গীতে সঞ্চয় ব্যানার্জীকে গভীর আলিঙ্গনে বেষ্টন করে আছে। চোখেমুখে তার অদম্য কাম-পিপাসা!

– কি রে পবিত্র, হ'ল কি তোর? কথা বলছিস না কেন?

– কি আর বলব!

– শ্রী কি সত্যি সত্যি পরীক্ষার তাগিদেই মাসীমার কাছে ফিরে এসেছে?

– হয়ত' তাই।

– সঞ্জয়দার সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি হয় নি ওর, তাহলে?

– হয়ত' হয় নি।

– "আহ্", বিরক্তিতে মাথা ঝাঁকাল বিজয়া, "তোর এক্স্ট্রা সেন্সরি পর্সেপ্শন – মানে তোর দূরদৃষ্টি – কি বল্ছে, শুনি"।

– কি আবার বল্বে! কিছুই বল্ছে না।

– অর্থাৎ – ?

– অর্থাৎ, তুই যে কয়েকদিন আগেই বললি আমাকে ভবিষ্যতের ছবি না দেখতে? আশ্চর্য! ভুলে গেলি এরই মধ্যে?

একটু থেমে পবিত্র আবার বলল, "আমি আর ও পথে হাঁটছি না, বাবা"।

* * * * *

পরের কয়েকটা দিন নীরব উদাসীনতায় কেটে গেল শ্রীতমার। সকালে উঠে, তৈরি হয়ে সাইকেল চেপে ইউনির্ভাসিটি চলে যায়। সন্ধ্যেবেলা ফিরে এসেই চা করে। গৌরীকে এক কাপ চা দিয়ে, নিজের চা'টা নিয়ে ঘরে চলে যায়। বইখাতা নিয়ে বসে যায়।

খানিক পরে গৌরী টেবিল সাজিয়ে খেতে ডাকলে, ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মায়ের সঙ্গে খেতে বসে শ্রীতমা। মা-মেয়ের সংক্ষিপ্ত কথোপকথন হয় সেই সময়টাতে। খাওয়-দাওয়া সেরে, টেবিল পরিষ্কার করে, এঁটো বাসন-কোসন রান্নাঘরের সিংকে নিয়ে গিয়ে মেজে ফেলে সে। তারপর, এক কাপ কফি করে নিয়ে ফিরে যায় আবার নিজের ঘরে।

একদিন সন্ধ্যায় খেতে বসে, নীরবতা ভঙ্গ করে গৌরী বললেন, "তোর পরীক্ষার প্রস্তুতি কেমন এগোচ্ছে"?

– খুব ভাল।

– রেজাল্ট খুব ভাল হবে তো?

– আশা করছি।

– আচ্ছা, সঞ্জয় এখানে একবারও তো এলো না। কেন?

– ব্যস্ত আছে নিজের কাজে।

– তা তোর সঙ্গে দেখা করে তো ইউনির্ভাসিটিতে? কাজের ফাঁকে ফাঁকে?

– করে।

– ভাবছি, কাল-পরশু নাগাদ একটা ফোন করব জামাইটাকে।

এতক্ষণ খুব সহজ ভঙ্গীতে কথা বলছিল শ্রীতমা। হঠাৎ মায়ের জামাইকে ফোন করার বাসনা শুনে চম্‌কে উঠে বলল, "না, না। ওকে ফোন করো না তুমি। কাজের মধ্যে কেউ ফোন করলে বিরক্ত হয়"।

কি এমন রাজকার্য, যে কয়েক মিনিট ফোনে কথা বলতেও নারাজ সঞ্জয়! বিস্মিত হলেন গৌরী।

বললেন, "তোর সঙ্গেও তো দেখি ফোনে কথা হয় না, তার। আশ্চর্য"!

– "আমরা দুজনেই ব্যস্ত, মা। খুব ব্যস্ত। সেই জন্যই . . . ."

এরপর মা মেয়ে দুজনেই নীরব হয়ে যে যার কাজে উঠে গেলেন।

কথাটা সত্যি। আপাততঃ সঞ্জয় শ্রীতমার ফোনেও বাক্যালপ বন্ধ। এবং এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী শ্রীতমা। সঞ্জয়ের ফোন এলেই ও সঙ্গে সঙ্গে লাইন কেটে দেয়। কাজটা যে খুব অভদ্র এবং অসামাজিক, বোঝে শ্রীতমা। কিন্তু গভীরভাবে আহত ওর অন্তর মেনে নেয় না। বিদ্রোহ করে।

সঞ্জয়ের কাছাকাছি হলেই ওর মনে হয়, ওদের মাঝখানে শর্মিলা বসু নামে আর একজন দাঁড়িয়ে আছে। অদৃশ্য থেকেও তার অস্তিত্ব প্রবলভাবে অনুভব করে শ্রীতমা। সে এখন সঞ্জয় আর শর্মিলার থেকে অনেক দূরে সরে যেতে চায়। ভাবতেই চায় না মোটে ওদের কথা।

পরীক্ষার ঠিক আগে, ইউনির্ভাসিটিতে একদিন সকালে যেতেই হ'ল শ্রীতমাকে লাইব্রেরি থেকে আনা কয়েকটা বই ফিরিয়ে দিতে।

লাইব্রেরির মধ্যে ঢুকেই প্রথমে দেখা হয়ে গেল যার সঙ্গে, সে রাজীব। রাজীব সান্যাল। কাউন্টারেই দাঁড়িয়ে। শ্রীতমাকে দেখতে পেয়ে নির্মল হাসিতে ভরে গেল ওর। শ্রীতমা বই ফিরিয়ে ওর দিকে চেয়ে বলল, "হ্যালো রাজীব, লং টাইম নো দেখা সাক্ষাৎ"!

– "চলুন বাইরে গিয়ে কথা বলি? এখানে . . . . "

– "ঠিকই তো! লাইব্রেরির মধ্যে কথা বলা তো নিষিদ্ধ", মনে মনে একটু অপ্রস্তুত হয়ে ভাবল শ্রীতমা।

ওরা বাইরে বেরিয়ে এলো।

– "চলুন বিন্দাস রেস্টোরেন্টে গিয়ে লাঞ্চ করা যাক্। আসবেন"? রাজীব জিজ্ঞেস করল।

– "চলুন", একটু ইতস্ততঃ করে বলল শ্রীতমা।

ওরা দুজন বিন্দাস রেস্টোরেন্টের দিকে হেঁটে চলল মধ্যগতিতে।

– "আপনাকে আর একবার অনেক, অনেক অভিনন্দন। আই.পি.এস. পরীক্ষাতে প্রথমবারেই উত্রে যাবার জন্য। ওয়াও"! শর্মিলা বলল।

– "ধন্যবাদ", রাজীব হাসিমুখে বলল, "আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ, আমার হয়ে "গুঞ্জন"এর অফিসে প্রক্সি দেবার জন্য। সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ।

– "আপনি তাহলে প্ল্যানমতই এগোচ্ছেন, তাই না ? কিছু কর্পোরেট মানুষদের সাফ করে ভারতকে অন্ততঃ একটু পাপমুক্ত করার উদ্দেশ্যে"? সকৌতূকে বলল শ্রীতমা।

– "আপনার মনে আছে কথাটা"? হো হো করে হেসে উঠল রাজীব। পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বলল, "হ্যাঁ, আশার, উন্মাদনার এবং উচ্চাকাঙ্খার ঝোঁকেই পুলিস সর্ভিস জয়েন করছি আমি। সফল হব কতটা, সেটা আমার ভাগ্যের ওপর নির্ভর করবে"।

– ভাগ্য! আপনিও তাহলে ভাগ্য মানেন? জীবনে সাক্সেস্ফুল হতে গেলে শুধুমাত্র পুরুষকারই নয়, ভাগ্যেরও কিছু অবদান আছে – একথা মানেন আপনি?

– মানুষের জীবনে ভাগ্যের পরাক্রম অস্বীকার করব এমন স্পর্দ্ধা আমার নেই। কর্মপথে শত-প্রতিশত চেষ্টা এবং ক্ষমতা নিয়ে এগিয়ে গেলেও – সফল হব কিন না – এই শেষ প্রশ্নের উত্তরটি কিন্তু ভাগ্যের হাতেই তোলা থাকে।

– "তাই"? মনে মনে ভাবছে শ্রীতমা।

– একদম তাই। ইংলিশে প্রবাদ বাক্য আছে বীয়িং ইন্ দ্য রাইট প্লেস অ্যাট্ দ্য রাইট টাইম; অথবা বীয়িং ইন্ দ্য রং প্লেস অ্যাট্ দ্য রং টাইম – আমাদের এক একটি কাজের পরিণতির মূলে এটাই হ'ল শেষ কথা।

– এতখানি বিশ্বাসের সঙ্গে আপনি বলছেন একথা!

– "বল্ছিই তো। আপনি ভাগ্যে বিশ্বাসী ন'ন বুঝি?" রাজীব হাসল, "তবে এই নিয়ে এখন আমাদের ডিবেট আরম্ভ না করাই ভাল, কি বলেন? বড্ড খিদে পেয়েছে"।

ওরা ততক্ষণে বিন্দাস রেস্টোরেন্টে পৌঁছে গিয়েছে। আসন্ন পরীক্ষার জন্যই সম্ভবতঃ রেস্টোরেন্ট প্রায় ফাঁকা। ওরা একটা টেবিল বেছে নিয়ে, চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসল।

বেয়ারা আলুর পরোটা আর চিকেন সুখার অর্ডার নিয়ে চলে গেল। সঙ্গে কফি।

– তারপর, আপনি কি এবার ট্রেনিংয়ে যাবেন? কোন হিল স্টেশনে নিশ্চয়ই?

– "ঠিক। আমি দেরাদুনে যাচ্ছি। সেখানে সাংঘাতিক ফিজিকল ট্রেনিংয়ের আর নিয়ম-কানুনের মধ্যে জীবন কাটাতে হবে, অনেকগুলো মাস কাটাতে হবে। একেবারে, যাকে বলে অগ্নি পরীক্ষা! প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারব কি না, কে জানে!" একটা কৃত্রিম দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল রাজীব।

– "যাঃ! কি যে বলেন," শ্রীতমা ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, "সকাল-সকাল এরকম কথা বলতে নেই। আর তাছাড়া আপনার আসল মিশনটা তো কম্‌প্লীট করতে হবে, না কি? ভারতকে অন্ততঃ একটু পাপমুক্ত করার মিশন"?

ওর দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে খানিক চেয়ে রইল রাজীব। শ্রীতমার প্রতি এখনো আকর্ষণ বোধ করে ও। লেশমাত্র লিপ্সা জড়িয়ে নেই সেই আকর্ষণে। শ্রীতমার সান্নিধ্যে এলে রাজীবের মনে হয় যেন পরস্পরের হিতৈষী, সম-মনা দুই বন্ধুর, ভবিষ্যৎ অভিমুখে একক যাত্রা ওদের।

এক সময়ে, শ্রীতমার প্রতি একটা মুগ্ধ আবেগ ওর ছিল। এমন কি বহুবার মন-মনে ভেবেওছিল তার কাছে নিজের অনুরাগ ব্যক্ত করবে। এবং একদিন রাজীব হয়ত' শ্রীতমাকে স্ত্রী হিসেবে কাছে পাবে, এধরণের একটা স্বপ্নও অন্তরে লালন করত সে। কিন্তু হুট্ করে একদিন শ্রীতমার বিয়ে হয়ে গেল। সেই বিয়েতে রাজীব আমন্ত্রিত পর্যন্ত হল না। মনের কথাটা আর শ্রীতমাকে জানানো হল না রাজীবের।

– "আপনার নিজের কি খবর বলুন এবার", রাজীব বলল, "পড়াশোনা? বিবাহিত জীবন"?

– পড়াশোনা ভাল চলছে। ইন্ ফ্যাক্ট আমি আবার আমার মায়ের কাছে ফিরে গিয়েছি।

– "কেন"? সচকিত হল রাজীব, "এটা কেন করেছেন"?

মুহূর্ত্তের জন্য, কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না শ্রীতমা। তারপর বলল, "পড়ালেখার সুবিধের জন্য। আর – আমার নিজেরও কিছু ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজন ছিল। তাই"।

– কি রকম ভাবনা-চিন্তা?

– আমার নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে।

বেয়ারা ওদের খাবার রেখে গেল টেবিলে। এক টুক্‌রো গরম আলুর পরোটা ছিঁড়ে মুখে পুরে রাজীব বলল, "বাঃ! ভালই বানিয়েছে পরোটা"। তারপর শ্রীতমাকে খানিক নিরীক্ষণ করে বলল, "আপনার ভবিষ্যৎ! মানে আপনার বিবাহিত জীবনের ভবিষ্যৎ কি"?

– "হুঁ", মুখ নামিয়ে, চিকেন সুখা সহ আলুর পরোটার গ্রাস মুখে তুলে আনমনে বলল শ্রীতমা। উত্তর শুনে আর একবার ওর মুখের চেহারাখানা ভাল করে নিরীক্ষণ করে রাজীব বলল, "দেখুন, আপনার বিবাহিত জীবনে যদি কোন সমস্যা ঘটে থাকে, আমাকে বলতেই পারেন। আমি হয়ত' একটা সমাধানও বাত্‌লে দিতে পারি"।

– নাঃ! স্বামী আর স্ত্রীর সমস্যার মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি কখনো সমাধান দিতে পারে না।

– হয়ত', আপনি ঠিকই বলছেন। যাই হোক্, আপনার শুভাকাঙ্খী হিসেবে বলছি, বিয়েটা কিন্তু ছেলেখেলা নয়। ইট্ ইজ্ আ সিরিয়স অ্যাফেয়র। সিদ্ধান্ত যা নেবেন, সেটা খুব ভালভাবে ভেবে চিন্তেই নেবেন। স্বার্থপরের মত শুধু আপনার নিজের নয়, আপনার স্বামীর দিকটাও বিবেচনা করবেন।

শ্রীতমা মাথা নেড়ে সায় দিল।

সেদিকে চেয়ে রাজীব আবার বলল, "আর একটা কথা কি জানেন? আমরা কেউ নিখুঁত নই। অতএব একে অন্যের দোষ-ত্রুটিগুলো মেনে নিয়ে চলাই কি শ্রেয় নয়? আর তাছাড়া –" একটু থেমে কফিতে চুমুক দিল রাজীব।

– আর তা ছাড়া?

– "আর তা ছাড়া", রাজীব আবার বলল "খুঁত বা নিখুঁত, ঠিক কি ভুল – এই ভাবনাগুলো তো এক একজন মানুষের কাছে এক একরকম। টোটলি রিলেটিভ – অর্থাৎ আপেক্ষিক। দুটো মানুষের, এক সঙ্গে এক পথে চলার সময়ে, এই ভাবনাগুলোর মধ্যেও একটা সমঝৌতা করে নিতে হয়। অবশ্য একটু সময় লাগে"।

– "আপনি কিন্তু এবার দার্শনিকের মত কথা বলছেন, রাজীব", শ্রীতমা হাসল, "এবার বলুন তো আপনার গর্ল ফ্রেন্ড হয়েছে কি না"?

– নাহ্, নো গর্ল ফ্রেন্ড য়েট্। এখনো সে মেয়ের দেখা পাই নি। আমার সময় কোথায় বলুন। আমি ভেবেছি, মা আমার যার সঙ্গে বিয়ে দেবে, তাকেই বিয়ে করে নেব।

– ও মা! সে কি কথা! সুপরিটেন্ডেন্ট অফ্ পুলিশ হবে যে, তার মুখে এ কি কথা! একেবারে বেমানান।

– হয়তো বা বেমানান! ঐ যে বললাম না, জীবনে সব কিছুই আপেক্ষিক। আমার তো মনে হয়, বিয়ে ক'রে আন্‌কোরা একটা জীবন আরম্ভ করব আমরা। একে অন্যের মনমত ক'রে গড়ে নেব নিজেদের।

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেল শ্রীতমা। মনে মনে বলল, আপনি যে কোনদিন কাউকে ভালবাসেন নি, রাজীব, তাই আন্‌কোরা নতুন ক'রে নিজেদের গড়ে নেবার কথা ভাবতে পারছেন। কোন নারী আপনাদের মধ্যবর্তিনী হয়ে দাঁড়াবে না। উই আর সো লকি!

ওদের লাঞ্চ খাওয়া শেষ হল। দাম চুকিয়ে, উঠতে গিয়েও বসে পড়ল রাজীব। শ্রীতমাও তখন চেয়ার ছেড়ে ওঠার উদ্‌যোগ করছিল। তার দিকে চেয়ে রাজীব বলল, "আর একটা খুব ইম্‌পর্টেন্ট কথা আমি বলতে চাই। সম্পর্কের প্রসঙ্গে। পরিসরের ছায়ার কথা একবার আপনার সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। আপনার কি মনে আছে"?

– "আছে", ঘাড় নেড়ে শ্রীতমা বলল।

– আপনাকে অনুরোধ করছি, নিজস্ব পরিসরের ছায়াগুলোকে ভুলবেন না। আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্কে যেটুকু ছায়া নির্দিষ্ট আছে তার মধ্যেই যেমন আমরা দু'জনে আবদ্ধ, ঠিক তেমনি আপনার হস্‌বেন্ডের সম্পর্ক পরিসরে আপনাদের দু'জনের ধার্য ছায়ার মধ্যে আপনি সুখে বাস করুন। তৃতীয় কাউকে এর মধ্যে ঢুকতে দেবেন না। আবার আপনি নিজেও আপনার পরিসরের ছায়া লংঘন করে অন্য কারো ছায়াতে ঢুকে পড়বেন না। প্রতিটি ছায়ার নিজস্ব নৈতিকতা আছে। সেই নৈতিকতার স্পষ্ট ধারণা থাকা আমাদের উচিত।

– আপনার এই আইডিয়াটা আমার কাছে বিশেষ পরিষ্কার নয়, রাজীব। কিন্তু আমি এটা নিয়ে ভাবব, বুঝতে চেষ্টা করব।

– গুড। চলুন এবার ওঠা যাক।

ওরা রেস্টোরেন্ট্ থেকে বেরিয়ে পরস্পরকে বিদায় জানিয়ে নিজেদের গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হল।

শ্রীতমা ইউনির্ভাসিটির মেন গেটের দিকে এগিয়ে চলল।

বাইরে বেরিয়ে একটা অটো ধরতে হবে।

আনমনে রাজীবের কথাগুলো আনাগোনা করছিল শ্রীতমার মনে।

প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব পরিসরের মধ্যে তার প্রতিটি সম্পর্ক-ছায়া নাকি পৃথক নৈতিকতা-সূত্রে আবদ্ধ। সেই নৈতিক বোধকে সম্মান দিয়ে চলাটাই নাকি সুখী ও সফল জীবনের প্রথম শর্ত।

আচ্ছা, ব্যাপারটা কি সত্যিই এত সহজ! আজকের ব্যক্তিত্ববাদী সমাজে কি এই ধারণা বাস্তবিকই প্রযোজ্য? শ্রীতমার মনে হয় না।

সঞ্জয় আর শর্মিলা বসু কি তাদের সম্পর্কের নৈতিকতা লংঘন করবে না কোনদিন? অবশ্যই করবে। আর শ্রীতমার সরে আসার পর ওদের সম্পর্ক-ছায়ার নিয়ম কানুনও যে বদলে যাবার কথা! তাহলে আর তাদের লংঘন করার প্রশ্নও তো ওঠে না।

– শ্রী, কোথায় যাচ্ছ?

ওর ঠিক পেছনে সঞ্জয়ের গলা। ছাঁৎ ক'রে উঠল বুকটা! পেছন ফিরে দেখল যা ভেবেছে ঠিক তাই! অনতিদূরে সঞ্জয় দাঁড়িয়ে।

সঞ্জয় কৌতূকের হাসি হেসে বলল, "তোমার না এখন পরীক্ষার পড়ার জন্য ছুটি চল্‌ছে"?

– "হ্যাঁ, চল্‌ছে তো", ধীরে ধীরে বলল সে।

– তাহলে তুমি এখানে কি করছ ?

– কয়েকটা কাজ ছিল, তাই লাইব্রেরিতে এসেছিলাম।

– আমারও আজ লেক্‌চর নেই। তাই মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছিলাম।

– ভালই তো। মর্নিং ওয়াক ইজ্ অল্‌ওয়েজ গুড ফর ইউ।

– যাবে নাকি আমাদের বাড়ি ? অনেকদিন তো নিজের বাড়ি ছাড়া তুমি ! অবশ্য ঠিক কেন যে বাড়ি-ছাড়া, তা আমি এযাবৎ বুঝে উঠ্‌তে পারি নি! এনি ওয়ে, চলো না একবার বাড়িতে ?

– "আজ পারব না", শ্রীতমা বলল, "অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে এম্‌নিতেই। অনেক পড়াশোনা আছে আমার। আর একদিন ---"

– এসো না, অল্প সময়ের জন্য, প্লীজ। আমি তোমাকে মায়ের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব, না হয়।

সঞ্জয়ের অনুরোধে অনুনয় সুস্পষ্ট। কি করবে ভেবে না পেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শ্রীতমা।

– "এসো, এসো, প্লীজ", সঞ্জয় এগিয়ে এসে ওর ডান হাতটা ধরল।

অগত্যা! যেতেই হ'ল। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মৃদুস্বরে বলল, "চলো"।

অল্প সময়ে বাড়ির সুমুখে এসে পড়ল ওরা।

চাবি দিয়ে বাড়ির দরজা খুলল সঞ্জয়। ওর পেছন পেছন বাড়িতে ঢুকেই চট্ ক'রে চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে ভারি আশ্চর্য হয়ে গেল শ্রীতমা। তাই তো! যেমন ভাবে সাজানো গোছানো বাড়িটা রেখে গিয়েছিল, ঠিক সে রকমটিই সাজানো

গোছানো আছে সব কিছু। অথচ শ্রীতমা জানে সঞ্জয় কি ভীষণ অগোছালো। শ্রীতমাকে রোজ ইউনির্ভাসিটি থেকে ফিরে এসে বাড়ি গোছাতে হ'ত। সঞ্জয় অনেক সময়ে বলত, "আচ্ছা, আমরা কি বাড়িতে থাকি না ডল্‌স্ হাউসে? এ বাড়িতে যে দুজন মানুষ বিচরণ করে, কাজকর্ম করে, লেখাপড়া করে – তার কি কোন চিহ্নই থাকতে নেই কোথাও"?

মাঝে মাঝে আবার পরিহাস-তরল কণ্ঠে বলত সঞ্জয়, "আর দ্যাখো, আমরা যে রোজ বিছানায় এমন আবেগ প্রবণ অনুরাগে মিলিত হই, তারও কোন চিহ্ন দেখা যাবে না? সব সময়ে ছিম্‌ছাম্ বিছানা বেড কভারের তলায় আবৃত হয়ে থাকবে"!

তার মানে, এখন সঞ্জয় নিজেই বাড়িঘর সাজিয়ে রাখে শ্রীতমার মনের মত।

এতটা আশা করে নি শ্রীতমা।

– কি খাবে বলো? চা আর অমলেট? খুব দারুণ অম্‌লেট করি আমি, সে তো তুমি জানোই! না কি, লুচি করব? ফ্রিজে খানিকটা কষা মাংস রাখা আছে – কালকে থেকে লেফ্‌ট্ ওভর।

খুব সহজ, স্বাভাবিক, আন্তরিকভাবে কথাগুলো বলল সঞ্জয়। যেন শ্রীতমার সঙ্গে ওর সম্পর্কটা চিড় খেয়ে যায় নি। যেন আড়াই মাস আগে শ্রীতমা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যায় নি। এখনো এখানেই আছে, ঠিক আগের মত! যেমন ছিল, সঞ্জয়ের হৃদয়ের রাজরানী হয়ে!

– নাঃ! রাজীবের সঙ্গে একটু আগেই বিন্দাস রেস্টোরেন্টে লাঞ্চ খেয়েছি।

– রাজীব? সে আবার কে?

– বলেছিলাম তোমাকে ওর কথা। রাজীব আমাদের ডিবেটিং টিমে আছে। আমার প্রতিপক্ষে ডিবেট করেছিল কয়েকবার। তাছাড়া "গুঞ্জন"-এর সম্পাদকীয় কমিটিতেও ছিল রাজীব।

– "ও হ্যাঁ, এবার মনে পড়ছে। "গুঞ্জন"এ তুমি তো ওর জায়গায় প্রক্‌সি দিচ্ছ, না"?

– "হ্যাঁ", মাথা নেড়ে সায় দিল।

ওরা দুজন ডাইনিং স্পেসে এসে চেয়ারে বসল। পাশাপাশি।

– তা রাজীবের জীবনে বেশ বড়সড় একটা পরিবর্তন আসছে, জানো", শ্রীতমা যেন আত্মবিস্মৃত হয়ে হঠাৎ সেই আগের সময়টাতে ফিরে গেল, যখন ইউনির্ভাসিটি থেকে ফিরে এসে এমনিভাবেই সঞ্জয়ের সঙ্গে গল্প করত, "রাজীব এখন অ্যাকাডেমিয়া ত্যাগ করে অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশনে চলে যাচ্ছে। ও আই.পি.এস. ট্রেনিংয়ে চলে যাচ্ছে খুব শীঘ্রই"।

সঞ্জয় চুপ ক'রে ওর দিকে চেয়ে রইল।

– "রাজীবের জীবনে যে পরিবর্তন আসছে, তার সঙ্গে ও খাপ খাওয়াতে পারবে তো? কে জানে", মৃদুকণ্ঠে আবার বলল শ্রীতমা।

– কেন? খাপ খাওয়াতে পারবে না কেন?

– কারণ ও একজন বুদ্ধিজীবি, দার্শনিক টাইপের ছেলে। আর পুলিশের যে জীবনটা ও বেছে নিচ্ছে সেটা উশৃংখল, অমার্জিত। রফ্। রাজীব উইল বী ট্রেডিং অন্ রগেড্ ল্যান্ডস্। হয়ত' ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাবে ও।

– রাজীবকে কি তুমি ভালবাসো, শ্রী?

প্রশ্ন শুনে চমকে উঠে শ্রীতমা বলল, "হ্যাঁ, বাসি। শুধু যে ভালবাসি তাই না, ওকে আমি অ্যাড্‌মায়ার করি; অথবা হীরো ওয়র্শিপও বল্‌তে পারো।

– আর আমাকে ? আমাকে কি তুমি ভালবাসো, এখনো ?

আহা, কি ছিরি প্রশ্নের, শ্রীতমা ক্ষিপ্ত হয়ে মনে মনে বলল। আশ্চর্য! দেখছিস, তোকে ছেড়ে গৃহত্যাগ করেছি, তাও এ ধরণের প্রশ্ন করে নাকি কেউ!

সহজ, ঠান্ডা গলায় সে উত্তর দিল, "ঠিক জানি না। আমি এখন কন্‌ফিউস্‌ড্‌। দোটানায়। সমায় হয়ত' একদিন দিতে পারবে তোমার প্রশ্নের উত্তর।

– "ঠিক আছে। সময়ের জন্য অপেক্ষা করে থাকব আমি", মুচ্‌কি হেসে সঞ্জয় বলল, "এসো, আমরা দুজনে বিছানায় গিয়ে একটু হুটোপুটি করি। আমাদের দুজনের দেহমনের অনেক অবসাদ মুহূর্ত্তে উধাও হয়ে যাবে। দেখে নিও। আই বেট্‌"।

কথা শুনে রাগে আপাদমস্তক জ্বলে গেল শ্রীতমার। তীব্রস্বরে বলল, "ছিঃ! এত নীচে নেমে যেত পার তুমি! ছিঃ, ছিঃ"!

– ছিঃ কেন? আমরা স্বামী-স্ত্রী নই?

– "আমার এখন যথেষ্ট সন্দেহ আছে কতদিন তোমার স্ত্রী হয়ে থাকতে পারব আমি", বল্‌তে বল্‌তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শ্রীতমা। তারপর "আমি চল্‌লাম" বলে সে হন্‌হনিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

সঞ্জয় দ্রুত অগ্রসর হয়ে গিয়ে ওকে জাপ্‌টে ধরে বলল, "কি ছেলেমানুষি করছ বল তো? অযথা রাগ আর জেদ ক'রে আমাদের সম্পর্কটা নষ্ট ক'রে ফেলো না, শ্রী। জেনো যে একটা সম্পর্ক গড়তে অনেক সময় লাগে, কিন্তু তাকে ধ্বংস করে ফেলতে লাগে মাত্র কয়েক মিনিট। কিছুতেই নষ্ট করে ফেলো না আমাদের ভালবাসার সম্পর্ক", বল্‌তে বল্‌তে স্ত্রীর অধরে চুম্বন করল সঞ্জয়। আবেশে চোখদুটো বুজে ফেলল শ্রীতমা। মাত্র কয়েক মিনিট। সহসা শর্মিলা বসুর স্মৃতি ভেসে এলো ওদের মাঝখানে। শর্মিলাকে এই দুটো হাতে জড়িয়ে ধরে, ঠিক এমনি ভাবে, না জানি কতবার আদর করেছে এই লোকটা! চুম্বন করেছে অজস্রবার, ভালবাসায় পাগল হয়ে। আর এখন? শর্মিলাকে মন থেকে মুছে দিয়ে সেই লোকই অনায়াসে শ্রীতমাকে ভালবাসছে! আদর করছে! ছিঃ! অসহ্য এই দ্বিচারিতা।

এক ঝট্‌কায় নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে চাপাকণ্ঠে হিস্‌হিস্‌ করে বলল শ্রীতমা, "লজ্‌জা করে না তোমার? কতবার, ঠিক কতবার, একজন মানুষ প্রেমে পড়তে পারে বল তো"?

আহত চোখে ওর দিকে একটুক্ষণ চেয়ে রইল সঞ্জয়। বিষণ্নকণ্ঠে বলল, "কতবার প্রেমে পড়তে পারে একজন মানুষ ? তোমার এই প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারব না। কিন্তু এটুকু বল্‌তে পারি যে, তোমার জন্য আমার ভালবাসা নিঃসন্দেহে আন্তরিক। আমার যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারি তোমার জন্য। এটা তুমি জেনে রেখো। আর এটাই সত্যি।

* * * * *

রাগে গরগর করতে করতে সেদিন সঞ্জয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল শ্রীতমা। ওর অনেক অনুরোধ-উপরোধ অবজ্ঞা ক'রে। একটা অটো ধরে বাড়ি ফিরে এসেছিল অতঃপর। আর হঠাৎ মাথাটা ধরে গিয়েছিল ফেরার পথে। তাও বাড়ি ফিরে, জোর ক'রেই বই-পত্র খুলে বসেছিল কিছুক্ষণ। কিন্তু শত চেষ্টাতেও নিজেকে শান্ত করতে পারে নি। পড়ায় মন বসাতে পারে নি। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে, একটা পেনকিলর খেয়ে শুয়ে পড়েছিল। এবং অচিরেই দুই চোখের পাতায় ঘুম নেমে এসেছিল।

দুপুর পেরিয়ে বিকেল এবং বিকেল গড়িয়ে কখন যে সন্ধ্যে নেমে এসেছিল এরপর টের পায় নি শ্রীতমা। ঘুমটা ভাঙ্গল গৌরীর ডাকে। চোখ মেলে দেখল, মাথার গোড়ায় ওর মা দাঁড়িয়ে। উদ্বিগ্ন হয়ে ডাকছেন, "শ্রী, কি হ'ল তোর? এই অবেলায় ঘুমোচ্ছিস যে"!

– "ওহ্, মা, তুমি এসে গিয়েছ"! ধড়মড়িয়ে বিছানার ওপর উঠে বসল শ্রীতমা।

– হ্যাঁ, এই তো বাড়িতে ঢুকলাম। তা তুই এখন ঘুমোচ্ছিস যে?

– মাথাটা খুব ধরেছিল, তাই একটু শুয়েছিলাম। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি!

– মাথার আর দোষ কি! একে গরম পড়ে গিয়েছে, তার ওপর সারাদিন বই মুখে নিয়ে বসে আছিস! এই পরীক্ষা-পর্ব শেষ হলে বাঁচি আমি। তোর সঙ্গে সঙ্গে আমারও পরীক্ষা চলছে যেন! ধৈর্যের পরীক্ষা।

বিছানা থেকে উঠে মন্থরগতিতে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল শ্রীতমা।

– কি ব্যাপার? রান্নাঘরে কি করবি?

– একটু কফি করব। তোমার আমার জন্য।

খানিক পরে, কফি আর বিস্কুট নিয়ে ওরা মা-মেয়ে খাবার টেবিলের পাশে চেয়ার টেনে বসল।

– "তারপর, সকালে গিয়েছিলি নাকি ইউনির্ভাসিটি? বই ফিরিয়ে এলি"? গরম কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে গৌরী জিজ্ঞেস করলেন।

– হ্যাঁ।

– দুপুরে তোর খাওয়ার জন্য চিকেন চাউমিন ক'রে রেখে গিয়েছিলাম। খেয়েছিলি তো?

– না। আজ ইউনির্ভাসিটি ক্যাম্পসে রাজীব সান্যালের সঙ্গে লাঞ্চ খেলাম। আলুর পরোটা আর চিকেন সুক্খা।

– "সে কি"! মনে মনে শিউরে উঠে গৌরী বললেন।

– "কেন? কি হ'ল"? শ্রীতমা অবাক!

– কি হ'ল! কবে তোর বুদ্ধি-শুদ্ধি পাকবে রে, শ্রী? যখন যা মনে হয় ক'রে বসিস। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে।

গৌরীর কথাগুলো অনেকটা বিলাপের মত শোনাল।

– কি হ'ল মা? কি করলাম আমি?

– আর কি হ'ল! আশ্চর্য! ইউনির্ভাসিটি ক্যাম্পসের ভেতরে তুমি একটা ছেলের সঙ্গে বসে লাঞ্চ করছ! গল্প-আলাপ ক'রছ! সঞ্জয় যদি এটা দেখে ফেলত! কি হ'ত তাহলে", গৌরী বললেন, "অবশ্য সে নিজে না দেখলেও বা কি! ওর কোন ইয়ার-দোস্ত বা ছাত্র তোদের দুজনকে দেখে, ছুটে গিয়ে সঞ্জয়ের কানে লাগিয়ে দিতেই পারে"!

– কেন মা? কি লাগাবে ওরা? আর তা'ছাড়া, সঞ্জয় কত বচ্ছর ধরে বিদেশে লেখাপড়া করেছে। সেখানে ছেলে-মেয়েদের অবারিত মেলামেশা দেখেছে। শুনলেও ও কিছু মনে করবে না।

আসলে সঞ্জয়ের সাথেও যে আজ ওর দেখা হয়েছে, কথাবার্ত্তা হয়েছে, এবং রাজীবের সঙ্গে লাঞ্চ খাওয়ার কথাটাও যে শ্রীতমা স্বয়ং তার স্বামীর কানে তুলে দিয়েছে, সবটাই সে মায়ের কাছে চেপে গেল।

– দ্যাখ্, শ্রী, পুরুষ মানুষ যতই উদার-চিত্ত হোক না কেন, নিজে সে যতই মেয়েদের সঙ্গে অবারিত মেলামেশা করুক না কেন, তার নিজের স্ত্রীর পরপুরুষের সঙ্গে দহরম-মহরম সে ভাল চোখে দেখবে না। জেনে রাখ্ এই মর্মান্তিক সত্যটা।

– তার মানে কি নৈতিক নিয়ম-কানুন পুরুষ আর নারীর ক্ষেত্রে আলাদা, মা? আজকের সমাজেও?

– অবশ্যই। সময়ের সঙ্গে সমাজের নিয়ম যতই পাল্টাক না কেন, মেয়েমানুষ আর ব্যাটাছেলের মূল প্রবৃত্তি কোনদিনই বদলাবে না। জেনে রাখিস।

– মূল প্রবৃত্তি! কি বলতে চাইছ তুমি, মা?

– মানে এই যে – সমাজে শত পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও মেয়েমানুষের গর্ভে সন্তান ধারণ করা, সন্তান প্রসব করা, বুকের দুধ দিয়ে সেই সন্তানকে লালন করা – কোনদিনই পাল্টাবে না। আবার ওদিকে, প্রকৃতির নিয়মে ব্যাটাছেলে মাত্রই বহুগামী। মেয়েদের সহজাত মাতৃত্ব এবং ছেলেদের প্রকৃতিজাত বহুগামিতা – কোনদিন বদলাবে না। বদলাতে পারে না।

– তার মানে, আমরা যে সমাজে নারী পুরুষের সম-অধিকারের জন্য এত হৈ-হল্লা, হাঙ্গামা-আন্দোলন করছি, সে সবই বৃথা যাবে?

– অন্ততঃ এ ক্ষেত্রে আমি তো সেরকমটাই মনে করি। বিষয়টা নিয়ে অবশ্য তোদের অনেক ডিবেট এবং প্রচুর আবেগ পূর্ণ তর্কাতর্কির অবকাশ আছে, সেটাও আমি মানি।

শ্রীতমা নির্বাক হয়ে বসে রইল।

গৌরী আবার বললেন, "আর শুধু আমি কেন, আমার মত মধ্যবয়স্ক মহিলারাও তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং পরবর্ত্তীকালে তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে এই মোক্ষম সত্যিটাই বুঝতে পেরেছেন। এই সমাজে পুরুষ-নারীদের একটা মস্ত বড় অংশই আমার ধারণা পোষণ করেন। বিশ্বাসও করেন। একদিন তোর মামীকেই জিজ্ঞেস ক'রে দেখিস না, কি বলে"!

পরীক্ষাটা শেষমেষ এসেই গেল। প্রথম দিন, দুরুদুরু বক্ষে শ্রীতমা যখন পরীক্ষার হলে ঢুকতে যাবে, দেখল একটু দূরে সঞ্জয় দাঁড়িয়ে আছে। নিজের অজান্তেই গুটিগুটি কয়েক পা ওর দিকে এগিয়ে গেল সে। সঞ্জয় কাছে এসে বলল, "বেস্ট অফ্ লক্, ম্যাম। খুব আশা করে আছি, মেধাবীদের সারিতে প্রথম কয়েক জনের মধ্যে থাকবে"।

– ধন্যবাদ। তুমি এবার বাড়ি যাও। আর এসো না এখানে আমাকে উইশ করতে।

– কেন?

– আমার মনটা যদি অকারণে রেস্টলেশ হয়ে যায়, তাহলে পরীক্ষা দেব কেমন করে?

হন্‌হন্ ক'রে হেঁটে শ্রীতমা পরীক্ষার হলে ঢুকে গেল। ওর চলে যাবার পথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সঞ্জয়। মুখে স্নিগ্ধ হাসি।

শ্রীতমার পরীক্ষাটা এসেছিল দীর্ঘদিনের অপেক্ষা ও প্রস্তুতির পর, কিন্তু চলে গেল হুড়মুড় ক'রে।

শ্রান্ত, অবসন্ন, চিন্তামুক্ত শ্রীতমা, পরীক্ষার শেষ দিনে যখন ইউনির্ভাসিটির মেন গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কথা নেই বার্ত্তা নেই, যেন হাওয়া থেকে আবির্ভূত হয়ে সঞ্জয় ওর সামনে এসে দাঁড়াল।

বিনা ভূমিকায় বলল, "এবার তাহলে চলো"।

– "কোথায়"? বিস্মিত হয়ে ওর দিকে তাকাল শ্রীতমা।

– প্রথমে তোমার আর আমার বাড়ি। তারপর আমার করা এক কাপ গরম কফি খেয়ে নিয়ে আমরা যাব তোমার পরীক্ষার অবসান সেলিব্রেট করতে। হাউ ডজ্ দ্যাট্ সাউন্ড?

শ্রীতমার বুকটা দুলে উঠল। কিন্তু সেই দোলাচল প্রকাশ পেল না ওর অভিব্যক্তিতে। বলল, "আমাকে এখন বাড়ি ফিরতে হবে। আমার আর মা'র বাড়ি। সেখান থেকে মন্দিরে গিয়ে সংকটমোচনকে প্রণাম জানিয়ে আমরা দুজনে মামার বাড়ি যাব"।

সঞ্জয়ের জ্বলজ্বলে মুখের ওপর নিরাশার সূক্ষ্ম ছায়া নেমে এসে মিলিয়ে গেল। সে হেসে বলল, "ঠিক আছে, তাই চলো তাহলে। তোমার মামার বাড়িই যাওয়া যাক্ – সংকটমোচনকো প্রণাম করতে হুয়ে। চয়ন-চন্দনের সঙ্গেও দেখা হয়ে যাবে, বহুদিন পর। চলো"।

– "না", শ্রীতমা বলল, "যতক্ষণ না আমার মনের দোটানা পুরোপুরি কেটে যায়, আমার বাড়ির কারো সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ করার দরকার নেই তোমার"।

– মনের দোটানা! সেটা আবার কি? এতদিন শুনি নি তো! তুমি বলেছিলে পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে তোমার নিজস্ব স্পেশ দরকার। তাই তুমি মায়ের কাছে গিয়ে আছো। এখন বলছ –"

– ঠিকই বল্‌ছি। পরীক্ষা ছিল আমার একটা অজুহাত মাত্র। আসলে আমি তোমার কাছ থেকে পালিয়ে আসতে চাইছিলাম। এখনো আমি প্রচন্ড দোটানায়। কি করব বুঝতে পারছি না।

– "পারবে। ঠিক পারবে তুমি দোটানা-মুক্ত হতে। শুধু মনকে বোঝাও যে তুমি আমাকে ভালবাসো। আমাদের স্বামী-স্ত্রীর যে নিবিড় সম্পর্কটা ধ্বংস হয়ে যেতে দেবে না তুমি। কিছুতেই না। তাহলেই দেখবে ---"

– "দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমাকে এবার বাড়ি যেতেই হবে। মা ওখানে অপেক্ষা ক'রে আছে", নির্লিপ্ত স্বরে শ্রীতমা বলল।

– শ্রী, আমি বড্ড একা। আমার খুব হেল্পলেস্, ভীষণ অসহায় লাগে। প্লীজ, আমার কাছে ফিরে এসো তুমি। আর রাগ ক'রে থেকো না।

আর একবার জোরে ভূমিকম্প হ'ল শ্রীতমার বুকের মধ্যে। প্রচন্ড সেই কম্পনের ধাক্কায় বিপর্যস্ত হল ওর দেহমন। কয়েক মিনিট। মাত্র কয়েক মিনিট। মনের আয়নায় ভেসে উঠল শর্মিলা বসুর সঞ্জয়কে প্রত্যাখ্যান ক'রে চলে যাওয়ার দৃশ্যটা। সঞ্জয়ের কাছেই শুনেছিল। এইভাবেই তো কান্নাকাটি করেছিল সঞ্জয়, যখন শর্মিলা ওকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

চোয়াল শক্ত ক'রে শ্রীতমা বলল, "আহ্! নাটক ক'র না তো"।

স্তব্ধ, নির্বাক হয়ে ওর চলে যাওয়ার দিকে চেয়ে রইল সঞ্জয়। তারপর কতটা সময় যে কেটে গিয়েছিল খেয়াল করে নি সে।

– "হ্যালো সঞ্জয়দা, এখানে চুপ্‌চাপ্ দাঁড়িয়ে কি করছেন"? সহসা পেছন থেকে পবিত্রর ডাক শুনে ফিরে তাকাল সঞ্জয়। হেসে বলল, "তোমারও কি আজ পরীক্ষা শেষ হল না কি"?

– হ্যাঁ, তাই। আপনি এখানে একা একা, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে যে!

সঞ্জয়কে নিরুত্তর দেখে পবিত্র অনায়াসে বলে বসল, "চলুন, আপনাদের বাড়ি যাই। একটু গরম চা পেলে মন্দ হয় না। কি বলেন"?

– নিশ্চয়ই। চলো যাই।

আধ ঘন্টার মধ্যে পরোটা, মটর পনির, ডিমের ডালনা আর চা হাজির হয়ে গেল পবিত্রর সামনে।

– "উরেব্বাস্! এই সব রান্না আপনি করেছেন? কখন শিখলেন রান্না করতে"? পবিত্র মুগ্ধ বিস্ময়ে বলল।

– মেলবোর্নে থাকতে। আমার এক বান্ধবী ছিল, শর্মিলা বসু। তার কাছ থেকে অনেক রান্না শিখেছিলাম। আজ তোমাকে যা কিছু সার্ভ করলাম, সবই গতকাল বানিয়েছিলাম। আজ শ্রী বাড়ি চলে আসবে ভেবে।

পবিত্র আয়েস ক'রে পরোটার মধ্যে ডিমের টুক্‌রো জড়িয়ে মুখে দিয়ে বলল, "বাঃ! দারুণ হয়েছে। সত্যিই, হ্যাট্‌স্ অফ্ আপনাকে"।

– পবিত্র, তুমি খুব রোগা হয়ে গিয়েছ। মনে হচ্ছে অনেক ওজন কমে গিয়েছে তোমার। সে কি পরীক্ষার জন্য চিন্তায়, ভাবনায়, পরিশ্রমে?

– হতে পারে। আসলে আমাদের ছাত্র-জীবনে পরীক্ষাটা বড় মারাত্মক। স্বাস্থ্য কেড়ে নেয়। মুখের হাসি, রাতের ঘুম, খাওয়া-দাওয়ার আকাঙ্খা, বেঁচে থাকার সমস্ত উৎসাহ কোথায় যে উধাও হয়ে যায় কয়েকটা মাস। পরীক্ষা আমাদের জীনা হারাম ক'রে দেয়, সঞ্জয়দা। আপনার মত সহৃদয় মাস্টার মশাইরা একজোট হয়ে পরীক্ষা নামের প্রাণহানিকারক এই দৈত্যটাকে সমূলে উৎপাটিত ক'রে ফেলুন, দেখি।

ওর কথা বলার ভঙ্গি দেখে হেসে উঠল সঞ্জয়।

পবিত্র দারুন তৃপ্তি-সহকারে খাচ্ছে। ওকে দেখে ভাল লাগল সঞ্জয়ের।

– "আচ্ছা, সঞ্জয়দা, শ্রী কবে ফিরে আসছে এখানে"? খাওয়া থামিয়ে হঠাৎ পবিত্র প্রশ্ন করল, "আমি তো ভেবেছিলাম, আজ পরীক্ষা শেষ হলেই ও চলে আসবে"।

– আমারও তো সেই ধারণাই ছিল। তবে পরীক্ষা তো আজ সবে শেষ হ'ল। হয়ত' কয়েক দিনের মধ্যেই ফিরে আসবে, শ্রী।

– "সঞ্জয়দা, আপনাদের সম্পর্কে কোন চিড় খায় নি তো? সত্যি-সত্যিই কি পরীক্ষা দেবার কথা মাথায় রেখে শ্রী তার মায়ের বাড়ি গিয়ে উঠেছিল? না, আরও কোন কারণ আছে"?

সঞ্জয় আশ্চর্য হয়ে পবিত্রর দিকে চেয়ে বলল, "আমি যদ্দূর জানি পরীক্ষাটাই, একমাত্র কারণ ছিল। তোমাদের কি বলেছে সে, তা তো আমার জানার কথা নয়"।

– না, আমাদের বাড়তি তেমন কিছু বলে নি। কিন্তু দেখলে মনে হয় ওর বুকে দুরূহ একটা চিন্তা তোলপাড় করছে। ওর দু'চোখই বলে দেয়।

– হবে। তোমরা হয়ত' ওকে আমার চেয়ে বেশী বুঝতে পারো।

– সেটা যে অসম্ভব, সঞ্জয়দা। আমি ওর বন্ধু। কিন্তু আপনি তো ওর হজ্‌বেন্ড্। আপনার চেয়ে বেশী কাছের মানুষ ওর আর কে হতে পারে?

– আমার সঙ্গে শ্রীর পরিচয় মাত্র বছর খানেকের। কিন্তু তুমি তো ওকে দীর্ঘদিন চেনো।

– তো? আপনার কি মনে হয় শুধু দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বে স্বামী-স্ত্রীর অন্তরঙ্গতা কি আসতে পারে? না, সঞ্জয়দা। স্বামী আর স্ত্রীর ভালবাসা শুধুমাত্র সময়-সাপেক্ষ হতে পারে না কখনো। সে ভালবাসা সময়, দেশ-কাল-পাত্র কোন কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। "যদিদং হৃদয়ং তব, তদিদং হৃদয়ং মম" মন্ত্র দুটি মানুষকে মুহূর্ত্তে একাত্ম ক'রে দেয়।

– "তুমি কি কাউকে ভালবাসো, পবিত্র"? সঞ্জয় মুচ্‌কি হেসে বলল, "নইলে এতসব তুমি বুঝলে কি ক'রে"?

পবিত্র মনে মনে ভাবল খানিক। তারপর বলল, "আমি কাউকে ভালবাসি কি না, সেটা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু আমি বুঝতে পারি, আমার অন্তর থেকে অনুভব করতে পারি যে আপনারা দুজনে দু'জনকে গভীর ভালবাসেন। যদিও শ্রী সম্ভবতঃ এখন কোন কারণে খানিক অভিমান-ক্ষুব্ধ হয়ে আছে। সেটা যে ক'রে হোক কাটাতে হবে"।

– বেশ। না হয় মেনে নিলাম তোমার কথা। এখন তাহলে আমাকে কি করতে বলো?

– যে ক'রে হোক, শ্রীকে আপনার কাছে ফিরিয়ে আনুন। প্রয়োজনে, জোর ক'রেও। ওর নিজের মনের মধ্যে যদি কোন রকম ক্ষোভ বা সন্তাপ জমা হয়েই থাকে, ধীরে ধীরে সেটা মুছে যাবে।

– বলছ, সেটা সম্ভব?

– "হ্যাঁ, বলছি," দৃঢ়ভাবে উত্তর দিল পবিত্র।

– ভাল কথা। দেখি শ্রীকে ফিরিয়ে আনতে পারি কি না।

– পারি কি না নয়, সঞ্জয়দা, আপনাকে পারতেই হবে।

সঞ্জয় হাসল। পবিত্র যে এমন সহজ, সরল এবং সহৃদয় মানুষ, এর আগে সে ভাবে নি।

প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করে সে এবার হাসিমুখে, হাল্‌কা সুরে বলল, "কিন্তু, তোমাকেও তো নিজের শরীর-স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হবে, পবিত্র। তোমার মত বন্ধু সব সময়ে পাশে চাই, আমি, শ্রী, বিজয়া"। কি যেন সহসা মনে পড়ে গেল ওর। আবার বলল, "বাই দ্য ওয়ে, বিজয়ার কি খবর? বেশ কিছুদিন তাকেও তো দেখি না পরীক্ষা ফিভর নিশ্চয়ই"?

– "হ্যাঁ, ঠিক তাই," পবিত্র হাসল, "জয়া খামখেয়ালী মানুষ। বড়লোকের আদুরে কন্যে তো"!

– ওই যে বললাম, বড় লোকের আদুরে কন্যে।

– "খামখেয়ালী মানে"? ভুরু কুঁচকে সঞ্জয় বলল, "ডু ইউ মীন সী ইজ অ্যান্ এয়রি-ফেয়রি টাইপ? বাস্তবকে পাত্তা দেয় না? পৃথক্ জগতে একান্ত বাস করে"।

– আমার ওকে কিছুটা সে রকমই মনে হয়। বাস্তবের সঙ্গে ওর সম্পর্ক একটু কম।

ওরা দুজনেই কয়েক মিনিট চুপ করে রইল। নিজের মত ক'রে দুজনেই বিজয়া বলে মেয়েটার প্রোফাইল তৈরি করছে মনে।

– "যাক্, আমি এবার উঠি," হাত ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে পবিত্র বলল।

– আবার এম্‌নি ক'রে চলে এসো মাঝে মাঝে, পবিত্র। আড্ডা দেওয়া যাবে। আর তোমার গীটারটাও সঙ্গে নিয়ে এসো। শুনে দেখব কেমন শিখেছ।

– তাই হবে। এরপর গীটার বগলদাবা ক'রে আনব সঙ্গে।

পবিত্র চলে যাবার পর, নিজের জন্য হুইস্কি-অন্-রক্‌স্ তৈরি ক'রে নিয়ে এসে টি.ভি. টা খুলে দিয়ে সোফায় বসল সঞ্জয়। টি.ভি. তে তখন খবর চলছে। আর খবর মানেই তো যত সব দুঃসংবাদ। মারামারি, খুনোখুনি, ধর্ষণ, সুইসাইড বম্বিং এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিবরণ।

অথচ এখন টি.ভি. টা না চালালেও নয়! সারা বাড়ি মৃত্যুর নীরবতায় স্তব্ধ। এক প্রকার গা ছম্‌ছমে অনুভূতি গ্রাস ক'রে ফেলছে সঞ্জয়কে।

মনের ভেতরে ঘোর শূন্যতা। আজ বিকেলে শ্রীতমার সঙ্গে যে সব কথাবার্ত্তা হয়েছে এবং তার কিছু পরে, পবিত্রর সঙ্গে যে সকল আলোচনা হয়েছে, টুকেরা টুকেরা হয়ে ভেসে বেড়াতে থাকল ওর মাথার মধ্যে।

শ্রী কি বাস্তবিকই ওকে ঘৃণা করে এখন! পালিয়ে বাঁচতে চায় ওর নাগাল থেকে! যদি তাই হয় তাহলে শ্রীর সুমুখে গিয়ে বারংবার ভিখিরির মত দাঁড়িয়ে প্রেম নিবেদন ক'রে তাকে এবং নিজেকে বিব্রত করারও যে কোন মানে হয় না!

অথচ পবিত্র বলে গেল সে অন্তর থেকে বিশ্বাস করে যে শ্রী এখনও সঞ্জয়কে গভীর ভালবাসে! শুধু অভিমান ক'রে দূরে সরে গিয়েছে! পবিত্র তো আরও বলল, শ্রীকে আপনার কাছে ফিরিয়ে আনুন!

কি করা উচিত এখন সঞ্জয়ের!

ডোর বেলটা বেজে উঠল হঠাৎ। "কে আবার এলো এই সময়ে", বলে কিছুটা বিরক্ত হয়েই উঠে গিয়ে, আলো জ্বেলে দরজা খুলল সঞ্জয়। এবং আগত মানুষটিকে দেখে ভূত দেখার মত চম্‌কে উঠল।

– "মে আই কম্ ইন্", ভেতরে ঢুকে ছোট্ট প্যাসেজে এসে দাঁড়াল শর্মিলা বসু। সঞ্জয়ের দিকে চেয়ে সকৌতূকে বলল, "কি ব্যাপার, সঞ্জয়, আমাকে দেখে একেবার বাক্‌রোধ হয়ে গেল যে? এতটাই সারপ্রাইজ্‌ড্ হয়েছ তুমি"! মুহূর্ত্তে সঞ্জয়ের মুখ রক্তবর্ণ। কান গরম এবং কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

অনেক আয়াসে নিজেকে সংযত ক'রে সে বলল, "কি ব্যাপার! তুমি! এখানে"!

এদিক ওদিক চেয়ে শর্মিলা আবার বলল, "তোমার ওয়াইফকে দেখছি না যে? বাড়িতে নেই"?

– "না, সে কয়েকদিনের জন্য তার মায়ের বাড়ি গিয়েছে"।

– হাউ অন্‌ফর্চুনেট্। আমার সঙ্গে তাহলে দেখাই হবে না, এ যাত্রা!

সঞ্জয়ের বলার অপেক্ষা না ক'রে শর্মিলা অতঃপর এগিয়ে গিয়ে সোফায় বসল। সঞ্জয়ের হুইস্কির গ্লাসটা তুলে নিরীক্ষণ ক'রে হেসে বলল, "মাই গড্, তুমি ঘরে একা বসে হুইস্কি খাচ্ছিলে? এই কাশী শহরে, ইউনি ক্যাম্‌পসের কোলে বসে"!

সঞ্জয় অপ্রস্তুত হল। দরজা খোলার আগে হুইস্কির গ্লাসটা ওর লুকিয়ে ফেলার কথা ছিল কিন্তু তালেগোলে ভুলে গিয়েছিল।

সে শর্মিলার মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বলল, "তুমি বেনারসে কেন এসেছ? কোন কাজে নাকি"?

– অনেকটা তাই।

– কি কাজ?

– বলছি, কিন্তু তার আগে আমাকেও একটু হুইস্কি দাও না, সঞ্জয়। গলাটা বড্ড শুকিয়ে গিয়েছে।

– হুইস্কি! নাঃ। তোমাকে একটা লেডীস ড্রিংক বানিয়ে দিতে পারি, যদি বলো।

– ও.কে., বাবা, ও.কে.। তাই দাও তাহলে।

– ভরমুথ অ্যান্ড লেমনেড ককটেল? চল্‌বে?

– চল্‌বে, চল্‌বে। খুব চল্‌বে।। সত্যি আই অ্যাম ডাইং ফর আ ড্রিংক।

সঞ্জয় উঠে গিয়ে বেশ পরিপাটি ক'রে একটা বাহারে, লম্বা গ্লাস ভর্ত্তি ক'রে ভরমুথ ককটেল তৈরি ক'রে এনে নামিয়ে রাখল কফি টেবিলের ওপর। সঙ্গে কাজু আর ঝাল, ঝাল পোটেটো চিপ্‌স্।

এক নজর দেখে নিয়ে শর্মিলা হেসে বলল, "নাঃ! তুমি দেখছি অতিথি সৎকারের ব্যাপারে এখনও তেমনি আছো। বদলাও নি তেমন"?

সঞ্জয় চেয়ারে বসে তার হুইস্কির গ্লাসটা তুলে নিয়ে একটা চুমুক দিল। হাত বাড়িয়ে কয়েকটা কাজুও তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিল।

– "তোমার ওয়াইন ক্যাবিনেট্টাতেও তো দেখলাম বেশ ভাল কলেক্শন্ রেখেছ। বাড়িতে বসে নিয়মিত ড্রিংক করো"? শর্মিলা হেসে একটা চোখ টিপল, "বৌ কিছু বলে না? সে তো মনে হল নিম্ন মধ্যবিত্ত! সে অ্যালাউ করে তোমার ড্রিংকিং"?

– তুমি কি কাজে এসেছ বলছিলে?

– ও হ্যাঁ। আমি দিল্লীতে অল্ ইন্ডিয়া ইন্স্টিট্যুট অফ্ মেডিকল সায়েন্সেসে কাজ করি। কিড্নী স্পেশলিস্ট আমি। কিড্নী ট্রান্স্প্ল্যানটেশন আর ডায়লেসিসিও পড়ে আমার আওতায়। এখানে বি.এইচ.ইউ. মেডিকল স্কুলে একটা কন্ফরেন্স্ আরম্ভ হবে কাল থেকে। সেটা অ্যাটেন্ড করতেই আমার এখানে আসা।

– ও।

– কিন্তু কন্ফরেন্স ছাড়াও তোমার সঙ্গে দেখা করতে একবার আমাকে আসতেই হ'ত।

– কেন?

– কেন? কারণ আমার চিটির উত্তর তুমি দিলে না যে! মুখোমুখি হয়ে তোমার সঙ্গে কিছু আলোচনা করার গ্লাসে চুমুক দিল শর্মিলা। সঞ্জয় তার গ্লাসটা আর একবার ভরে নিয়ে ফিরে এসে চেয়ারে বসল।

– এবার বলো, তুমি কি আলোচনা করতে চাইছিলে আমার সঙ্গে।

– সঞ্জয়, আমার স্বামী সুশান্ত নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার পর থেকে, আমি বড় একা হয়ে গিয়েছি। আমার চারিপাশে অনেক মানুষের ঘোরাফেরা কিন্তু তারা আমার সঙ্গী হ'তে পারে না কেউ।

বিশেষ ক'রে রাতে বাড়ি ফিরে এসে আমি অসহনীয় নিঃসঙ্গতা, আর একাকীত্বের যন্ত্রণায় ভুগি। তখন প্রচুর পরিমাণে অ্যাল্কোহল না খেলে চোখে ঘুমই আসতে চায় না আমার।

– কিন্তু সুশান্ত – মানে তোমার স্বামী – উধাও হয়ে গেল কেন? হোয়াট ওয়াজ হিজ প্রবলেম?

– সে অনেক লম্বা কাহিনি। ছোট ক'রে বলতে গেলে, বলতে হয় যে সুশান্ত তার বন্ধুদের সঙ্গে একটা খুনের দায়ে জড়িয়ে পড়েছিল। তাই –

– "সে কি"! চম্কে উঠে, টানটান হয়ে বসল সঞ্জয়।

– হ্যাঁ, খুনের দায়ে! কিন্তু হরফ ক'রে বলতে পারি, সুশান্ত নির্দোষ। শুধু পরিস্থিতির জালে জড়িয়ে পড়েছিল সে। ওর দুর্ভাগ্য! হী ওয়াজ ইন দ্য রং প্লেস, অ্যাট দ্য রং টাইম।

– "কোথায় উধাও হয়ে গেল সুশান্ত ? প্রাণে বেঁচে আছে তো"? শংকিত গলায় বলল সঞ্জয়।

– আমার ধারণা, সুশান্ত বিদেশে চলে গিয়েছে। তবে ঠিক কোথায় গিয়েছে আমি জানি না। ওর বাবা-মাকে কতবার জিজ্ঞেস করেছি। কিন্তু ওঁরা প্রতিবার এড়িয়ে গেছেন।

– কি আশ্চর্য! তোমাকে বলছেন নাই বা কেন?

– "হয়ত' আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না"। কান্নাভরা শোনাল শর্মিলার গলার স্বর, "আসলে আমাদের বিয়ের কয়েক মাস পরই তো ঘটেছিল ঘটনাটা। ওঁরা আমাকে জানলেনই না ভাল ক'রে"।

– হুম্। তা আমার সঙ্গে কি আলোচনা করতে এসেছ তুমি?

– শান্তি নিকেতনে দেখা হবার পর থেকে, সঞ্জয়, তোমার কথা এত বেশী মনে পড়ে। এখন আমি বুঝি তোমার মত সৎ, শালীন, আন্তরিক এবং ভদ্র মানুষ দুর্লভ। আর আমি কি না তোমার ভালবাসাকে ওভাবে প্রত্যাখ্যান করলাম। তোমার আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলাম। আমি খুব অনুতপ্ত, সঞ্জয়। তোমাকে যে কঠিন আঘাত আমি দিয়েছিলাম, এখন সেই আঘাত শতগুণে আমাকে বিঁধছে। আমার কর্মফলের শাস্তি আমি ভোগ করছি।

আবেগের বশে এতগুলো কথা বলে ফেলে হাঁপাচ্ছে শর্মিলা। ঢক্‌ঢক্ ক'রে ভরমুখের গেলাসটা শেষ ক'রে সঞ্জয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "মে আই গেট্ আ রি-ফিল, প্লীজ"?

সঞ্জয় আর একটা ভরমুখ কক্‌টেল ক'রে এনে রাখল শর্মিলার সামনে, কফি টেবিলের ওপর।

নিজের স্কচ্ হুইস্কি গ্লাসটাও ভরে নিল আর একবার। চেয়ারের ওপর সোজা হয়ে বসে বলল, "ইমোশন্‌স্ অপার্ট, হাউ ক্যান্ আই হেল্প ইউ ? শর্মি কি ভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারি বলো। কিংবা আদৌ কি কিছু করতে পারি আমি এ ব্যাপারে? এটা তো নিতান্তই তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর আমি তৃতীয় ব্যক্তি, আ থর্ড পর্সন। বাইরের লোক"।

– "তুমি আমার জীবনে তৃতীয় ব্যক্তি? না সঞ্জয়, এখন বুঝতে পারি তোমাকে কতখানি ভালবাসি আমি। তোমাকে খুব অন্তরঙ্গ মনে হয় আমার"।

স্তব্ধ, স্তম্ভিত হয়ে শর্মিলার দিকে চেয়ে বসে রইল সঞ্জয়। এসব কি বলছে সে! কয়েক মিনিট পরে বলল, "ইট্‌স্ টূ লেট নাও। অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। ভুলে যেও না আমি এখন বিবাহিত"।

– তো! হলেই বা বিবাহিত? তুমি যে এখনো আমাকে ভালবাসো না? বুকে হাত দিয়ে বলতে পারো?

– "না, আমি তোমাকে আর বিন্দুমাত্র ভালবাসি না", দৃঢ়কণ্ঠে বলল সঞ্জয়, "ইন্ ফ্যাক্ট তোমার দ্বিচারিতাকে আমি ঘৃণা করি"।

– "আমাকে ভালোবাসো না তুমি আর? অতই সোজা বুঝি ভালোবাসার মানুষকে অন্তর থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় ক'রে দেওয়া"? শর্মিলা আহত কণ্ঠে বলল।

– আমি আমার স্ত্রী শ্রীতমাকে আমার সর্বস্ব দিয়ে ভালবাসি। যতদিন বেঁচে থাকব, তাকেই আমি ভালবাসব। আমার আর শ্রীতমার মাঝে, বাইরে থেকে তৃতীয় কেউ কোনদিন আসতে পারবে না।

বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে কয়েক মিনিট চেয়ে রইল প্রত্যাখ্যাত সেই নারী।

– "কি দেখেছ তুমি শ্রীতমার মধ্যে, সঞ্জয়"? তিক্তকণ্ঠে বলল শর্মিলা, "আমি কি ওর চেয়ে শতগুণে বেশী সুন্দরী নই? যোগ্যতা, শিক্ষা-দীক্ষা, স্টেটসের কথা না হয় বাদই দিলাম। বলো সঞ্জয়"?

– ভালবাসা ব্যাপারটা যে হৃদয়-জনিত শর্মিলা, সৌন্দর্য-জনিত নয় – "এ সত্যটাও তোমার মত বুদ্ধিমতী মহিলাকে বুঝিয়ে বলতে হবে? তুমি যে আবার আমাকে নিরাশ করলে"।

হুইস্কির চতুর্থ গ্লাসটা নিঃশেষ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে, নতুন কিছু বলার অবকাশ বন্ধ ক'রে দিয়ে বলল, "ঢের হয়েছে আলোচনা। এখন অনেক রাত। চলো, তোমাকে তোমার আস্তানায় নামিয়ে দিয়ে আসি"।

শর্মিলাও ততক্ষণে তার পানীয় শেষ করেছে। সে ক্ষুণ্নকণ্ঠে বলল, "আমাকে পৌঁছে আসতে হবে না। নিজেই চলে যেতে পারব"।

– "না, আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব। যত বড় কিড্‌নী বিশেষজ্ঞই হও না কেন তুমি, তুমি একজন মহিলা। তার ওপর আবার ড্রংক। তোমার জন্য এখানকার পথঘাট, এত রাতে মোটেই নিরাপদ নয়। চলো, ওঠো"।

– "আচ্ছা", বলে উঠে দাঁড়াল শর্মিলা।

ওরা দুজনে বাড়ির বাইরে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। সঞ্জয় দরজাটা লক্ করছে, হঠাৎ শর্মিলা টাল সামলাতে না পেরে, আচম্‌কা ওর গায়ের ওপর ঢলে পড়ল। সঞ্জয় বুঝতে পারল তখুনি ওকে শক্ত হাতে না ধরলে, বারান্দার ওপর গড়াগড়ি খাবে শর্মিলা।

– "আরে, আরে, একি"! ব'লে দুই হাতে ওকে চেপে ধরল সে। শর্মিলাও দুই হাতে জড়িয়ে ধরল সঞ্জয়ের গলা। তারপর নিজের মাথাটা রাখল ওর বুকের ওপর।

– "সঞ্জয়দা"! বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চম্‌কে সঞ্জয় দেখল, "পবিত্র এসে দাঁড়িয়েছে ওদের পাশে।"

– এ কি, পবিত্র তুমি? এত রাতে?

পবিত্র আলিঙ্গন-বদ্ধ ওদের দিকে এক ঝলক দেখে মনে মনে শিউরে উঠল।

কি আশ্চর্য! এ যে সেই লাস্যময়ী নারী! পবিত্র যাকে মনশ্চক্ষে দেখেছিল! এম্‌নিভাবেই নাগিনী-কন্যার মত আস্টেপৃষ্টে পেঁচিয়ে ধরেছিল সঞ্জয়দাকে! চিন্তার স্রোত খুব দ্রুত খেলে গেল ওর মাথায়। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

– "কি ব্যাপার, পবিত্র"? নিজেকে শর্মিলার হাত থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে সঞ্জয় আবার প্রশ্ন করল।

– "বাড়ি গিয়ে খেয়াল হ'ল আমার ঝোলা ব্যাগটা এখানে ফেলে রেখে গিয়েছি। আমার জরুরি জিনিস-পত্র আছে ওই ব্যাগে। তাই ওটা নিতে আবার ফিরে এলাম", সসংকোচে বলল পবিত্র।

সঞ্জয় চাবি দিয়ে দরজা খুলে দিয়ে বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে রইল শর্মিলার সঙ্গে। পবিত্র বাড়ির মধ্যে ঢুকে ওর ব্যাগটা দেখতে পেল, ডাইনিং স্পেশের এক কোণে মেঝের ওপর রাখা। আরও দেখল, বসার ঘরে কফি টেবিলের ওপর রাখা দুটো নিঃশেষিত মদের গেলাস। প্লেটে রাখা কিছু কাজু বাদাম আর চিপ্‌স্। সারা ঘর জুড়ে ভেসে বেড়াচ্ছে ফরাসী পর্ফিউমের গন্ধ!

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে সে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে এল। সঞ্জয় আবার সদর দরজাটা লক্ ক'রে পবিত্রকে বলল, "ইনি আমার সেই অস্ট্রেলিয়ার বান্ধবী শর্মিলা বসু। দিল্লী থেকে এখানে এসেছেন কয়েকদিনের কন্‌ফরেন্সে। একটু অসুস্থ বোধ করছেন, তাই আমি এখন ওঁকে হোটেলে পৌঁছে দিতে যাচ্ছি"।

শর্মিকে নমস্কার জানিয়ে পবিত্র বিদায় নিল।

অবশেষে সঞ্জয় যখন শয্যায় আশ্রয় নিল, রাত তখন গভীর। এক ঝাঁক চিন্তা-ভাবনা ওর বুকের মধ্যে তুমুল ঝড় তুলল।

শর্মির সঙ্গে ওই অবস্থায় তাকে দেখে পবিত্র কি ভাবল কে জানে! ও কি ঘটনাটা বিজয়া বা শ্রীতমাকে গিয়ে বলবে!

শর্মির কথাগুলোই বা কেমন ধারা! সে নাকি সঞ্জয়কে আবার নতুন ক'রে পেতে চায়। প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় নিজের ভুলের!

আর শ্রীতমা? সঞ্জয় যখন নিজের অতীত ভুলে গিয়ে সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে চিরস্থায়ী ভালবাসার নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ হতে মনেপ্রাণে প্রস্তুত হল, ব্যগ্র হল শ্রীতমাকে একান্তভাবে কাছে টেনে নিতে, তখনি কি না সঞ্জয়ের প্রতি উদাসীন হয়ে সে দূরে সরে গেল! বারংবার চেষ্টা ক'রেও শ্রীতমার অন্তরের ক্ষোভ, অভিমান দূর ক'রতে পারল না সঞ্জয়! কি করবে সে এবার?

শ্রীতমা আসার আগে ওর অতীতে যা কিছু ঘটেছিল, শত চেষ্টা করলেও তো সঞ্জয় সেই সব ঘটনাকে মুছে ফেলতে পারে না! তাছাড়া অতীতের সমস্ত অভিজ্ঞতা বহন ক'রেই না আজ সে বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে। অতীত আর বর্তমানের সংযোগই তো এনেছে ওর জীবনের ধারাবাহিকতা। সেই অতীতকে কি ভাবে অস্বীকার করবে সঞ্জয়!

* * * * *

(চলবে)

ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায় – জন্ম বারাণসী শহরে। দীর্ঘকাল মেলবোর্ণ শহরের বাসিন্দা। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে এম. এ.। মেলবোর্ণের মনাশ ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটর সায়েন্সে ডিপ্লোমা। বিভিন্ন সরকারী রিসার্চ বিভাগে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসন ও অধ্যাপনার কাজে যুক্ত ছিলেন। দেশ, সানন্দা, আনন্দবাজার পত্রিকা, নবকল্লোল এবং বর্তমান সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা। উপন্যাস এবং ছোট গল্প প্রকাশিত হয়েছে শারদীয় দেশ, সানন্দা ও আনন্দলোকে। অবসর সময়ে বই পড়তে ভালবাসেন। ভালবাসেন ভ্রমণ। ছন্দসীর প্রকাশিত গ্রন্থ – অভিযান (আনন্দ), মায়াজাল (আনন্দ), ছায়া পরিসর (লাল মাটি প্রকাশন), নির্বাচিত গল্প প্রথম ভাগ (দাশগুপ্ত পাব্লিশার্স) এবং Seven Favourite Stories – translation of seven short stories by Sirshendu Mukhopadhyay (Dasgupta Publishers)। ওয়েব সাইট : www.bando.com.au

স্বপ্না মিত্র

পাহাড় চুড়ো

পর্ব ৪ ও ৫

(৪)

মেমরি থেকে ফেরার পথে ট্রেনে সিদ্ধার্থ বলেছিল, "একদিন আমাদের বাড়িতে আসিস সোমনাথ। তোদের বাড়িতে দু-রাত থেকে গেলাম। মাসিমা কত যত্ন করলেন। মেসোমশাইকেও খুব ভালো লাগলো, কী স্মার্ট মানুষ, চারপাশের কত খবর রাখেন।"

সোমনাথ মাথা ঝাঁকিয়েছিল, "আসবো সিদ্ধার্থদা। ঠিকানা দিও।"

সোমনাথের পিঠে চাপড় মেরে সিদ্ধার্থ বলেছিল, "মাসিমার মত পিঠে পুলি করে নয়, তোকে খাওয়াবো আমার মা-র হাতের তৈরি কবিরাজি কাটলেট।"

সোমনাথ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, "কবিরাজি কাটলেট বাড়িতে ? আমি তো বিয়েবাড়ি আর রেস্টুরেন্ট ছাড়া কোনদিন চপ কাটলেট খাইনি।"

সিদ্ধার্থর মুখে তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল, "আমার মা এসব দারুণ বানায় জানিস, রেস্টুরেন্টের চাইতেও বেটার। চপ, কাটলেট, ফিশফ্রাই, মোগলাই পরোটা, চিকেন রোল সব। আমার জেঠিমা দারুণ মিষ্টি তৈরি করে। বাড়িতে এত বড় বড় রসগোল্লা, ল্যাংচা, অমৃতি।"

সেই থেকেই সিদ্ধার্থর বাড়িতে একদিন যাওয়া ডিউ ছিল সোমনাথের। পরপর পাঁচদিন কলেজ বন্ধ। একা একা হোস্টেলে বোর হচ্ছিল সোমনাথ। কী মনে হল, সিদ্ধার্থকে ফোন করে বলল, "ভাবছি আগামীকাল দুপুর দুটো নাগাদ তোমাদের বাড়িতে যাব। অসুবিধে নেই তো ?"

সিদ্ধার্থ বলল, "চলে আয়, বাড়িতেই আছি। তবে দুপুর দুটো কেন ? বারোটার মধ্যে এসে যাস, আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ করবো।"

"ঠিক আছে, বাড়ির ডিরেকশন দাও।"

একটু ভেবে সিদ্ধার্থ বলেছিল, "তুই তো কোলকাতা অত চিনিস না। ডিরেকশন দিই কী করে ? শোন, বাস থেকে নেমে ডানদিকের ফুটপাথ ধরে হাঁটবি, কিছুটা এগিয়ে দেখবি একটা চওড়া রক, সেখানে সারাদিনই এক দল ছেলে বসে আড্ডা মারে। এমনিতে ছেলেগুলো বখাটে, তবে পাড়াপ্রতিবেশীর খোঁজখবর জানে। ওই ছেলেগুলোকে আমার নাম বলে জিজ্ঞাসা করিস, আমাদের বাড়ি দেখিয়ে দেবে, তোকে আর ঠিকানা দেখে নম্বর গুনে গুনে বাড়ি খুঁজতে হবে না।"

বাস থেকে নেমে সিদ্ধার্থর কথা মত ডানদিকের ফুটপাথ ধরে কিছুটা এগিয়ে চওড়া রকটা সোমনাথ দেখতে পেল, কিন্তু সোমনাথের কপাল খারাপ, এই মুহূর্তে রকটা শূন্য, বখাটে ছেলেগুলোর কেউ চারপাশে কোথাও নেই। অগত্যা বাড়ির নম্বর গুনে গুনে তিনতলা গোলাপি বাড়িটার সামনে যখন সে এসে দাঁড়ালো, তার কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে।

সবুজ রঙের দরজার পাশে, একেবারে দরজার সমান উঁচুতে কলিং-বেলটা লাগানো। সোমনাথ কলিং-বেল বাজিয়ে অপেক্ষা করে, পুরো ষাট সেকেন্ড পেরিয়ে যায়, কেউ সাড়াশব্দ দেয় না।

দ্বিতীয়বার কলিং-বেল বাজাতে যাবে সোমনাথ, ঠিক সেই মুহূর্তে দোতলার ঝুলবারান্দা থেকে এক মাঝবয়সী মহিলা মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে, "কে ? কাকে চাই ?"

পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে সোমনাথ জিজ্ঞাসা করে, "সিদ্ধার্থদা আছে ? আমি আর সিদ্ধার্থদা এক কলেজে পড়ি।"

এক মুহূর্ত সোমনাথের আপাদমস্তক জরিপ করে মহিলা উত্তর দেয়, "এক মিনিট দাঁড়াও, আসছি।"

দোতলা থেকে একতলায় নামতে যেটুকু সময় লাগে সেইটুকুই, ভদ্রমহিলা এসে দরজা খুলে বলল, "বাবুয়া বাড়িতে নেই, তবে শিগগির এসে যাবে, তুমি আমার সঙ্গে ওপরে চলো।"

সোমনাথ বুঝলো সিদ্ধার্থর বাড়ির নাম বাবুয়া। সে আর কথা না বাড়িয়ে মহিলার পিছু পিছু দোতলায় উঠে এলো।

দোতলায় উঠে ভিতরে ঢুকেই একটা চওড়া করিডোর, করিডোরের বাঁ-দিকে ড্রয়িং-রুম।

ড্রয়িং-রুমে ঢুকে ফ্যান চালিয়ে দিয়ে মহিলা মৃদু হাসল, "তুমি পাখার হাওয়ায় বসো, আমি জল নিয়ে আসছি, খুব ঘামছো তুমি।"

ঘাম প্যাচপ্যাচে শরীরে সোমনাথ সাদা রঙের গদি আঁটা সোফায় বসে না, সোফা সেটের পাশে খুব সুন্দর নকশা করা দুটো কাঠের চেয়ার রাখা, তারই একটাতে বসে সে।

সোমনাথকে বসিয়ে রেখে মহিলা ড্রয়িংরুম থেকে চলে যায়, তবে পাঁচ-মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসে একটা কাঠের-ট্রে হাতে, ট্রে-র ওপর ঝকঝকে কাঁচের গ্লাসে পাতিলেবুর সরবত, সরবতের ওপর দু-টুকরো স্বচ্ছ বরফ ভাসছে।

সরবতের গ্লাস হাতে নিয়ে একটা বড় চুমুক দেয় সোমনাথ, তার ভিতরটা জুড়িয়ে যায়, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা আরাম ছড়িয়ে পড়ে শরীরে। গলার কাছে সার্টের পরপর দুটো বোতাম খুলে, ঘাড় থেকে কলারটা পিছনে ঠেলে রিল্যাক্স করে বসে সে।

এতক্ষণে তার অবসর হয় সামনের মহিলাটিকে ভালো করে পরখ করার। কে এই মহিলাটি ? আদবকায়দা দেখে মনে হচ্ছে বাড়ির কাজের লোক। তবে চেহারায় বা পোশাকপরিচ্ছদে সেরকম কোন ছাপ নেই। পরনের শাড়ি রীতিমত ধোপদুরস্ত, স্বভাবেও বেশ সপ্রতিভ। রাস্তাঘাটে মহিলাটিকে দেখলে কাজের লোক হিসেবে চিহ্নিত করা মুশকিল।

সোমনাথ ধীরে ধীরে লেবুর সরবতে চুমুক দিচ্ছিল, বাইরে আবার কলিং বেল বেজে ওঠে।

হাতের ট্রে সেন্টার টেবিলে তাড়াতাড়ি নামিয়ে রেখে মহিলা বলে, "ওই বাবুয়া ফিরে এসেছে বোধহয়, আমি যাই।"

মহিলা চলে যাওয়ার মিনিট দুয়েকের মধ্যেই সিঁড়ির দিক থেকে সিদ্ধার্থর গমগমে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, "ওহ, সোমনাথ এসে গিয়েছে ? আমাদের তাড়াতাড়ি ভাত দাও চারুমাসি, খুব খিদে পেয়েছে।"

ড্রয়িং-রুমে ঢুকে সোমনাথের মুখোমুখি উল্টোদিকের সোফায় বসে সিদ্ধার্থ, জিজ্ঞাসা করে, "কতক্ষণ এসেছিস ?" সেন্টার টেবিলে রাখা ট্রে-র দিকে তাকিয়ে বলে, "যাক, চারুমাসি তোর খেয়াল রেখেছে, শী ইজ আ নাইস লেডি !"

সোমনাথ ঘাড় হেলায়, "হ্যাঁ, খুব তেষ্টা পেয়েছিল আমার, তবে বলতে হয়নি, চারুমাসি নিজেই সরবত এনে দিল। তোমার মা কোথায় সিদ্ধার্থদা ? ওনাকে দেখলাম না তো।"

"মা বেরিয়েছে রে, ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। তবে চারুমাসি আমার জন্মের আগে থেকে এ বাড়িতে কাজ করছে, হাতের রান্না দারুণ।"

সোমনাথ হেসে ফেলে, "অত ফর্মালিটির দরকার নেই সিদ্ধার্থদা, মেসের খাবারের পাশে মা-মাসিদের হাতের রান্না অমৃত সমান।"

সিদ্ধার্থ ঘুরে ঘুরে ড্রয়িং-রুমের পেইন্টিং আর মার্বেলের শো-পিসগুলো দেখাচ্ছিল সোমনাথকে, তার মাঝেই চারুবালার ডাক আসে, "টেবিলে খাবার দিয়ে দিয়েছি, খেতে এসো।"

এইট-সিটার ডাইনিং টেবিলের এক পাশে তিনটে টেবিল ম্যাট। ম্যাটগুলো খুব নতুন নয়, তবে দামী এবং রুচিসম্মত। টেবিল ম্যাটের ওপরে ধবধবে সাদা কাঁচের প্লেট, প্লেটের পাশে চামচ, তার পাশে কাঠের কোস্টারের ওপর কাঁচের গ্লাসে টলটলে জল, তাতে এক চিলতে পাতিলেবুর টুকরো। খাবারের আয়োজন যে খুব এলাহি তা নয়, তবে প্রতিটি পদ সুদৃশ্য কাঁচের পাত্রে পরিবেশন করা হয়েছে। জলের জাগটা জার্মান সিলভারের, হাতলে সুন্দর কারুকাজ করা।

সিদ্ধার্থ আর সোমনাথ পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসলো, প্রনবেশ বসলেন উল্টোদিকে, সিদ্ধার্থর মুখোমুখি।

সোমনাথের প্লেটে দু-হাতা ভাত দিয়ে চারুবালা সিদ্ধার্থকে দিতে যাচ্ছিল, সিদ্ধার্থ বলে ওঠে, "আরে না না, ওকে আরও দাও চারুমাসি, সোমানাথ পুরো থালা ভরে ভাত খায়, আমি দেখে এসেছি।"

সোমনাথ বাধা দেয়, "না না, আর চাই না।"

সোমনাথের আপত্তি চারুবালা শোনে না, সে আরও ভাত ঢেলে দেয় সোমনাথের প্লেটে।

নিজের প্লেটে রাশিকৃত ভাতের দিকে তাকিয়ে সোমনাথের কেমন অস্বস্তি হয়। সত্যি, মাটিতে পিঁড়ি পেতে কাঁসার বগি থালায় বেড়াল টপকানো পরিমাণ ভাত খাওয়ার রূপ একরকম। কিন্তু কারুকাজ করা মেহগিনি কাঠের ডাইনিং টেবিলে ফিনফিনে বোন চায়নার প্লেটে তা যেন বেমানান।

সোমনাথ খাচ্ছিল, তবে খেতে খেতে তার চোখ চলে যাচ্ছিল এদিক-ওদিক। দেখলেই বোঝা যায় বাড়িটা বেশ পুরনো, তবে ওয়েল মেইনটেইনড। প্রতিটি ফার্নিচারই দামী, কিন্তু সাবেকী আমলের। বাড়িতে পেইন্টিং আর শো-পিসের ছড়াছড়ি। ড্রয়িং-রুমের দেওয়ালে অতগুলো পেইন্টিং, আবার ডাইনিং-স্পেসেও কত ছবি।

ডাইনিং টেবিলের সামনের দেওয়ালের মাঝখানের ছবিটা সে চিনতে পারে, ভ্যানগগের সূর্যমুখী।

সিদ্ধার্থ বোধহয় খেয়াল করে সোমনাথের কৌতূহলী চোখ, সে নিজে থেকেই বলে, "সব ছবিই কপি, কোনটাই রিয়েল নয়। যা কিছু মূল্যবান ছিল, সব বিক্রি হয়ে গিয়েছে।"

নাতির কথা শুনে প্রনবেশ একটু নড়ে বসেন, "কত ছিল। অত বড় জমিদার বাড়ির সব জিনিস কী আর কোলকাতার এই তিনতলা বাড়িতে ধরে! কিছু আনা হয়েছে, কিছু বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে, আর নষ্ট হয়েছে তার চেয়েও বেশি।"

দেওয়ালের কোনে একটা পেইন্টিং, সাদা লেসের টেবিল-ক্লথ, তার ওপর কাটগ্লাসের ফুলদানি, ফুলদানিতে এক গুচ্ছ হাল্কা বেগুনী রঙের লিলি।

লিলি ফুলগুলোর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে সোমনাথ বলল, "এই ছবিটা দারুণ, লিলি ফুলগুলো কী ফ্রেশ, যেন এই মাত্র বাগান থেকে তুলে আনা হল।"

প্রনবেশ ঘাড় ঘুরিয়ে ছবিটার দিকে তাকান, তাঁর মুখ ঝলমল করে ওঠে খুশিতে, "আমার দিদিমার আঁকা।" সোমনাথের গলায় বিস্ময়, "আপনার দিদিমা? তিনি জলরং করতে জানতেন?"

প্রনবেশের স্বরে স্পষ্ট গর্ব, "আমার দাদামশাই ছিলেন রায়বাহাদুর, বাড়িতে মেম আসতো দিদিমাকে ইংরিজি শেখাতে, সেলাই শেখাতে, আঁকা শেখাতে। আমার দিদিমা নিয়মিত খবরের কাগজ পড়তেন।"

খেতে খেতে সোমনাথ আগ্রহ সহকারে শুনছিল পুরনো দিনের গল্প। এক জন মনযোগী শ্রোতা পেয়ে প্রনবেশও খুলে ধরেন তাঁর স্মৃতির ভাণ্ডার। গল্প বলতে বলতে প্রনবেশ যেন ফিরে যান নিজের যৌবনে, যৌবন থেকে শৈশবে। মনে পড়ে মা, বাবা, দাদু, ঠাকুমাদের মুখে শোনা কত গল্প। আনন্দে তাঁর চোখমুখ চকচক করতে থাকে। অ্যালবামের পাতা উল্টে পরিবারের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস এক এক করে দেখানোর চেষ্টা করেন সোমনাথকে।

প্রনবেশ বলেন, "আমার বাবার মামাবাড়িতে হাতি ছিল। বাবার মুখে শুনেছি, বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নাকি পালাপার্বণে হাতির পিঠে চড়ে সোনার বল নিয়ে খেলত।"

প্রনবেশের সঙ্গে কথা হচ্ছিল সোমনাথের, সিদ্ধার্থ চুপচাপ খাচ্ছিল। প্রনবেশ সোনার বল নিয়ে খেলার গল্প করতেই হঠাৎ সিদ্ধার্থ বলে ওঠে, "ওরকম দু-চারটে সোনার বল তোমার সিন্দুক থেকে বের করে দাও তো দেখি, আমি একটা ফুল-টাইম ম্যাগাজিন করি। এসব এঞ্জিনিয়ারিং আমার ধাতে নেই, দশটা পাঁচটার চাকরি আমার দ্বারা হবে না।"

অকস্মাৎ তাঁর গল্পে বাধা পড়তে প্রনবেশ চুপ করে যান, টক দইয়ের বাটিটা সামান্য ঠেলে দিয়ে টেবিল থেকে উঠে পড়েন।

চারুবালা ব্যস্ত হয়ে বলে, "দই খেলেন না ? বিকেলে যদি আবার পেট ফাঁপে ?"

চারুবালার প্রশ্নের কোন উত্তর দেন না প্রনবেশ, সোজা নিজের ঘরের দিকে চলে যান।

প্রনবেশের দেখাদেখি সিদ্ধার্থও খাওয়া শেষ করে না, আমের চাটনির বাটি আছোয়া অবস্থায় পড়েই থাকে টেবিলে, সে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ায়।

সোমনাথের খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল আগেই। চারুবালা তাকে ডাইনিং-স্পেসের একপাশে বেসিন আর সাবান দেখিয়ে দেয়। বেসিনে হাত ধুয়ে সোমনাথ ড্রয়িংরুমের দিকেই যাচ্ছিল।

সিদ্ধার্থ বলল, "ড্রয়িংরুমে নয়, আমার ঘরে চল, খাটে হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে বসি।"

সিদ্ধার্থর ঘরটা আকারে বেশ ছোট, তুলনায় সুকুর গ্রামে সোমনাথের ঘর অনেক খোলামেলা। বিছানায় সিদ্ধার্থর বইখাতা ছড়ানো পড়েছিল, সেগুলো একপাশে জড়ো করে রেখে সোমনাথ খাটে পা ঝুলিয়ে বসে।

সিদ্ধার্থ বলে, "পা ঝুলিয়ে রাখলি কেন? পা তুলে বোস, রিল্যাক্স।"

সিদ্ধার্থর কথা মত শুধু পা তুলে নয়, কোলবালিশটা টেনে সামান্য কাত হয়ে বসে সোমনাথ। খাটের ওপর রাখা সিদ্ধার্থর বইগুলো উল্টেপাল্টে দেখতে শুরু করে। কোনটাই পাঠ্যপুস্তক নয়, দুটো কবিতার, একটা অর্থনীতির, আর দুটো ইংলিশ নভেল।

সোমনাথের মুখোমুখি ঘাড়ের পিছনে দুটো বালিশ গুঁজে পা লম্বা করে বসে সিদ্ধার্থ।

একটা কবিতার বইয়ের পাতা উল্টে দেখছিল সোমনাথ।

সিদ্ধার্থ বলল, "রিড দ্য পোয়েম, বেশ উঁচু গলায়।"

সোমনাথ সোজা হয়ে বসে বিছানায়, আবৃত্তির ভঙ্গিতে পড়তে শুরু করে, "আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি, এমন ছিলনা আষাঢ় শেষের বেলা, উদ্যানে ছিল বরষা-পীড়িত ফুল, আনন্দভৈরবী।"

উদাত্ত গলায় সিদ্ধার্থ বলে ওঠে, "আজ সেই গোঠে আসেনা রাখাল ছেলে, কাঁদেনা মোহনবাঁশিতে বটের মূল . . ."

সোমনাথের গলায় বিস্ময়, "এই বইয়ের প্রতিটি কবিতাই তোমার মুখস্থ নাকি সিদ্ধার্থদা?"

সোমনাথের প্রশ্নের জবাব দেয় না সিদ্ধার্থ, বরং পাল্টা প্রশ্ন করে, "তুই কি আবৃত্তি করতিস? গলা তো তৈরি!"

সোমনাথ লাজুক হাসে, "প্রতি বছর স্কুলের অ্যানুয়াল ফাংশনে। তবে আধুনিক কবিতা নয়। সঞ্চয়িতা বা সঞ্চিতা থেকে, বড় জোর সুকান্তর কবিতা।"

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করে, "কবিতা তোকে টানে ? আই মিন ভালো লাগে ? জানিস, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কী লিখেছিলেন ? "শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম . . ."

সোমনাথ মাথা নাড়ে, "আমি অত কবিতা পড়ি না সিদ্ধার্থদা, আর পড়লেও অর্থ বুঝি না। পড়ার বইয়ের বাইরে গল্প উপন্যাসই পড়েছি।"

সিদ্ধার্থর মুখের ভাব সিরিয়াস দেখায়, "গল্প উপন্যাস পড়িস মানে তোর সাহিত্যের দিকে ঝোঁক আছে, আর সেটাই দরকার। আমার থেকে একটা কবিতার বই নিয়ে যা, তোকে টাস্ক দিলাম, রোজ রাতে ঘুমোনোর আগে অন্তত দুটো কবিতা পড়িস। তারপর একদিন বসবো আমরা, আলোচনা করবো কবিতা নিয়ে।"

আধশোয়া অবস্থায় গল্প করতে করতে দুজনেরই চোখের পাতা লেগে এসেছিল। ভাত ঘুমের চটকা ভাঙতে সোমনাথ ধড়মড় করে উঠে বসে, সামনের দেওয়াল ঘড়িতে সময় দেখে, চারটে বাজতে দশ মিনিট বাকি। সিদ্ধার্থর দিকে তাকিয়ে দেখে সে তখনও পুরোদমে নাক ডেকে চলেছে।

চারটে বাজতে যাচ্ছে দেখে সোমনাথ তাড়াতাড়ি খাট থেকে নামে, তার খয়েরী রঙের প্যান্ট থেকে হাল্কা সবুজ রঙের সার্টটা বাইরে বেরিয়ে ঝুলছিল, প্যান্টের মধ্যে সেটা ফিটফাট ভাবে গুঁজে নেয়। ঘুমন্ত সিদ্ধার্থকে ডাকতে যাবে সে, পরদা সরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে এলো কোথা থেকে এক জলজ্যান্ত পরী! মেয়েটা অসম্ভব সুন্দরী, তবে চোখেমুখে গনগন করছে রাগ।

পরী "দাদা" বলে ডাক দিয়ে ঘরে ঢুকেই দেখতে পেয়েছে সোমনাথকে, আর সঙ্গে সঙ্গে সোমনাথের সামনেই পরী মুখ ভেটকে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তবে মেয়েটির তীক্ষ্ণ "দাদা" ডাকে সিদ্ধার্থর ঘুম ভেঙে গিয়েছে, সে চোখ মেলে তাকায় চারপাশে।

সোমনাথ আমতা আমতা করে, "সিদ্ধার্থদা, তোমার বোন।"

সিদ্ধার্থ উঠে বসে ঘড়ি দেখে, বলে, "ফাইভ মিনিটস। দেখি চারুমাসি কোথায়, চা দিতে বলছি, চা-বিস্কুট খেয়ে বাড়ি যা।"

ঘর থেকে সিদ্ধার্থ বেরোতেই ভেসে আসে পরীর তীব্র কণ্ঠস্বর, "তুই আমার ড্রয়ারে কেন হাত দিয়েছিলি দাদা ?"

উত্তরে সিদ্ধার্থ খিঁচিয়ে ওঠে, "বেশ করেছি হাত দিয়েছি, স্কেল খুঁজছিলাম। কেন, ড্রয়ারে কি তোর প্রেম পত্র আছে ?"

মেয়েটির জবাব সোমনাথ শুনতে পায় না, তবে শোনা যায় সিদ্ধার্থদার কড়া গলা, "চারুমাসিকে বলে আয় তো, দু-কাপ চা দিয়ে যেতে আমার ঘরে।"

সেদিন সিদ্ধার্থর বাড়ি থেকে ফেরার পথে সোমনাথের যেন দিব্যদৃষ্টি খুলে যায়। হতে পারে সোমনাথ আর সিদ্ধার্থ একই কলেজের ছাত্র, স্টুডেন্ট হিসেবেও দুজনে হয়তো একই মাপের, কিন্তু পারিবারিক ক্ষেত্রে দুজনের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য। শুধু আর্থিক অবস্থায় নয়, দুই পরিবারের জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও কোন মিল নেই।

সোমনাথের মা-বাবা সহজ সোজাসাপটা মানুষ, সরল জীবনযাপন তাদের, মানুষকে দু-হাত দিয়ে বুকে টেনে নিতে জানে। সিদ্ধার্থদারা মানুষ খারাপ নয়, তবে দুর্বোধ্য মত, ভীষণ ফাট। সোমনাথের মা-র থেকেও চারুমাসির পোশাক বেশি ধোপদুরস্ত। বাড়ির প্রতিটি কোনে সূক্ষ্ম রুচির ছাপ সুস্পষ্ট, তবু কোথাও যেন ফাঁক আছে। বাড়ির আবহাওয়া থম মারা, ব্যবহারে আন্তরিকতা কম, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ছাড়াছাড়া সম্পর্ক। সিদ্ধার্থদার ভাষায়, তালপুকুরে আর ঘটি ডোবে না। পয়সা নেই, তবু পয়সাওয়ালা ভাব, ডোন্ট কেয়ার অ্যাটিচিউড। আর ওটাই ওদের স্টাইল।

সোমনাথ আসবে জেনেও সিদ্ধার্থদা বাড়িতে ছিল না, চারুমাসিকে জানাতেও ভুলে গিয়েছে। সিদ্ধার্থদার দাদু শুধু নিজেদের গর্বের ইতিহাস বলে গেলেন, একবারের জন্যও সোমনাথের পরিবারের বিষয়ে জানতে চাইলেন না। সিদ্ধার্থদার বোনটা পুরো ধানী লঙ্কা, ফোঁসফোঁস করছিল রাগে, গাল দুটো টুকটুকে লাল আপেলের মত দেখাচ্ছিল। দাদার ঘরে অচেনা মানুষ সোমনাথকে দেখে সোমনাথের সামনেই মুখ ভ্যাংচালো!

দারুণ সুন্দরী সিদ্ধার্থদার বোন। সিনেমার পরদায় ছাড়া এত সুন্দর মেয়ে সোমনাথ আগে কখনও দেখেনি। তবে সোমনাথকে কেমন লেগেছে ওই পরীর ? নিজের মাথার চুল হাত দিয়ে পরখ করে সোমনাথ। ঠোঁট কামড়ায়, ইস মাথায় জ্যাবজ্যাবে করে তেল লাগানোর অভ্যাসটা তার আর গেল না!

সোমনাথ ভালো ছাত্র। আর ভালো ছাত্রদের প্রকৃতি হল, তারা যা করে মন দিয়ে করে। সিদ্ধার্থর দেওয়া কবিতার বই সে শুধু পড়েছে তা নয়, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য, দুই বাক্যের মাঝের না-বলা অংশটুকুও হৃদয়ঙ্গম করার প্রচেষ্টা করেছে।

প্রথমে হাতড়েছে সোমনাথ, হোঁচট খেয়েছে, এক সময় খুঁজে পেয়েছে সোনাঝুরি বিছানো পথ। এক অদ্ভুত মায়াময় অনুভূতিতে মুহ্যমান হয়ে গিয়েছে সে। তার বোধের তন্ত্রীতে কবিতা ছড় টেনেছে।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকায় সোমনাথ। দূরে সার সার পাম গাছের পিছনে পূর্ণিমার চাঁদ। কবিতার বই মুড়ে পাশে সরিয়ে রাখে সে, টেবিল থেকে টেনে নেয় কাগজ ও কলম। আজ বিশ্বসংসার কুমন্ত্রণায় মেতেছে যেন। নাকি যৌবনের রহস্য, প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে !

সাদা কাগজের পাতায় ভেসে ওঠে পরীর মুখ, তার তিল ফুল নাক, হীরের নাকছাবি, চিবুকের খাঁজে বিন্দু বিন্দু ঘাম। একটা ম্যাজিক ঘটে যায় সুকুর গ্রামের ছেলে সোমনাথের পৃথিবীতে, জীবনে প্রথমবার সে দশ লাইনের একটা আস্ত কবিতা লিখে ফেলে।

(৫)

চারপাশে গাছগাছালির মধ্যে ছোট্ট ইট রঙা দোতলা বাড়িটা দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়। একতলায় গ্যারেজ, একটা বেডরুম উইথ অ্যাটাচড টয়লেট আর লন্ড্রি এরিয়া। দোতলায় ড্রয়িংরুম, ফ্যামিলি-রুম, ওপেন কিচেনের লাগোয়া ডাইনিং-স্পেস, ডাইনিং-স্পেসের পাশ দিয়ে সোজা চলে গিয়েছে চওড়া করিডোর, করিডোরের শেষে কমন টয়লেট। কমন টয়লেটের এক দিকে স্টাডি, অন্য দিকে গেস্ট বেডরুম। স্টাডির পাশে মাস্টার বেডরুম উইথ টয়লেট। বাড়ির পিছন দিকে দোতলায় মাস্টার বেডরুম আর ফ্যামিলি রুমের লাগোয়া একটা প্রশস্ত উডেন ডেক। সত্যি বলতে গেলে, এই উডেন ডেকটা দেখেই সোমনাথ বাড়ি পছন্দ করেছিল।

আয়তনে প্রশস্ত হলেও ডেকটা বেশ ছিমছাম ভাবে সাজানো। রাশি রাশি ফার্নিচার সেখানে গিজগিজ করছে না। এক পাশে দুটো ডেকচেয়ার আর ছোট্ট টিপয় রাখা। মাঝখানে ছ-টা চেয়ার সহ একটা বড় গোলটেবিল। ওই চেয়ারেই পিঠ হেলিয়ে গোল টেবিলে পা তুলে আরাম করে বসে আছে সোমনাথ।

পশ্চিমমুখী এই ডেকের সামনে এখন নয়নাভিরাম সূর্যাস্তের দৃশ্য। সূর্যের বেশিরভাগটাই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে পাহাড়িয়ার পিছনে। গোধূলি লগ্নে আকাশের গায়ে খুনখারাবী রঙের খেলা। লাল, কমলা, গোলাপি, বেগনে কত রঙের

শেড, খোলা প্যাস্টেলের বাক্স থেকে রঙ যেন অতর্কিতে ছিটকে ছড়িয়ে পড়েছে। এইমাত্র আকাশের গায়ে ফুটে উঠলো দু-চারটে তারা। অদূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ওকগাছ, মেপল-ট্রি, রেডউড-ট্রির পাতায় পাতায় সন্ধ্যা নেমে আসছে ধীরে ধীরে। দূরে আঙুরের ক্ষেত আর দেখা যাচ্ছে না, শুধু ঢালা সবুজের বিস্তারের উপস্থিতি বোঝা যাচ্ছে।

আজ সকালেও লংড্রাইভে বেরিয়েছিল সোমনাথ। সেই প্রথম যৌবন থেকেই লংড্রাইভ তার প্রিয় বিনোদনের উপায়। দু-পাশে ধুধু সবুজ, তার মাঝ দিয়ে মাইলের পর মাইল পথ শুধু ছুটে চলা। দূরে দূরে ছড়ানো পাহাড়িয়া, মাঝে মাঝে সরু সুতোর মত ঝরণা। তারই মাঝে হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়ে এক একটা র‍্যাঞ্চ প্রপার্টি। র‍্যাঞ্চ প্রপার্টির সংলগ্ন সবুজ জমিতে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে পালিত পশু।

অ্যামেরিকায় এসে সেটল করার পর থেকেই এই র‍্যাঞ্চ প্রপার্টি সোমনাথকে খুব টানত। এ যেন বাস্তবিকই সোনার পাথরবাটি, প্রকৃতির মাঝে বাস করেও শহুরে সুবিধা ছুঁয়ে থাকা।

সোমনাথের জন্ম হয়েছিল বর্ধমানের প্রত্যন্ত গ্রামে, প্রকৃতির কোলে। এডুকেশন আর প্রফেশনের কারণে সে গ্রাম থেকে শহরে এসেছিল, কিন্তু আজও তাকে প্রকৃতি চুম্বকের মত টানে। মানুষের ভিড়ে সে যেন হারিয়ে যায়, প্রকৃতির বিশালতা বা নির্জনতার আশ্রয়ে সে ফিরে পায় নিজেকে। পাহাড়, সমুদ্র, অরণ্য বা ধুধু প্রান্তরের সম্মুখে দাঁড়ালে যখন প্রতিদিনের চাওয়াপাওয়াকে বড় নগণ্য মনে হয়, সোমনাথ তখন ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে আপনাকে।

সামনের সেপ্টেম্বর মাসে তার বাষট্টি বছর পূর্ণ হচ্ছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় ন্যাপাভেলির কাছাকাছি এই র‍্যাঞ্চ প্রপার্টি সে কিনেছে দু-বছর আগে। সিলিকনভ্যালিতে ফ্রীমন্টে সোমনাথের বাড়ির সাইজ মন্দ ছিল না। আট হাজার স্কোয়ার-ফিট প্লটে তার তৈরি কিচেন গার্ডেন ছিল দেখবার মত। সোমনাথের স্ত্রী এরিনা বলতো, "সোমা, ইউ হ্যাভ গ্রীন ফিঙ্গার, যা লাগাও তাই ফলে এত এত।"

সোমনাথ হাসত, "আমি অজ গাঁয়ের ছেলে এরিনা। তেমন হলে ধান চাষ করেও দেখিয়ে দিতে পারি। এই সামান্য শসা, টম্যাটো, বেগুণ, বিনসের গাছ লাগানো তো বাচ্চাদের কাজ।"

তখন থেকেই সোমনাথের পরিকল্পনা ছিল, কোনদিন তেমন সেভিংস হলে সে একটা র‍্যাঞ্চ প্রপার্টি কিনবে নিশ্চয়ই।

এরিনা অবশ্য আপত্তি করতো, "মাথা খারাপ, র‍্যাঞ্চ প্রপার্টি মানে কম হলেও পঞ্চাশ একরের বেশি জমি। অত জমি দেখবে কে ?"

সোমনাথ হিসেব কষত, পঞ্চাশ একর মানে দেড়শো বিঘে জমি। সোমনাথের বাবার বর্ধমানেও দেড়শো বিঘে জমি ছিল না। তারপর তো অন্য ইতিহাস, ভাগ হয়ে গেল সব জমি। বর্তমানে বর্ধমানে সোমনাথদের আট বিঘে জমি আছে, তাতেই যা চাষবাস হয়।

সোমনাথ বলেছিল, "অর‍্যাগন বা কলোরাডো নয়, ক্যালিফোর্নিয়ায় অপেক্ষাকৃত ছোট র‍্যাঞ্চ প্রপার্টি পাওয়া যায়, দামও খুব বেশি নয়।"

সোমনাথ আর এরিনার দুই মেয়ে ও এক ছেলে। মেয়েদের নাম রেখেছে এরিনা নিজের পছন্দমত। বড় মেয়ে জুলিয়া, জুলিয়ার থেকে তিন বছরের ছোট এমিলি। সোমনাথ মেয়েদের ডাকে "জুলি" আর "মিলি" বলে। দুই মেয়ের পরে ছেলে, তার নাম রেখেছে সোমনাথ নিজে। পুত্র সন্তান হল বংশের বাহক, তাই সেখানে এরিনাকে হাত লাগাতে দেয়নি সোমনাথ। সে ছেলের নাম রেখেছে রণজয়, এরিনা ছেলেকে "জয়" বলে ডাকে।

বেশ কয়েকবার সিলিকনভ্যালির বাইরে ভালো অফার পেয়েছিল সোমনাথ। তবে ভ্যালির হ্যাপেনিং লাইফ ছেড়ে অন্য কোথাও শিফট করার প্রসঙ্গ উঠলেই তীব্র আপত্তি জানাতো জুলি, মিলি আর জয়।

ফ্রীমন্টের বাড়ি বিক্রি করে তারা যে ন্যাপাভ্যালিতে বাড়ি কিনেছে, সেটাও ছেলেমেয়েদের খুব পছন্দ নয়। তবে এই বিষয়ে সন্তানদের পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে সোমনাথ আর মাথা ঘামায়নি। কারণ জুলি, মিলি আর জয় এমনিতেই তো মা-বাবার সঙ্গে থাকে না।

জুলি আর মিলি দুজনেই এডুকেশনের খাতিরে বাড়ির বাইরে, জয়ও অনেকদিন হল মুভ আউট করে গিয়েছে। ন্যাপাভেলির কাছে এই তিন এশরের র‍্যাঞ্চ প্রপার্টির খবর পাওয়া মাত্রই সোমনাথ ফাইন্যাল ডিসিশন নিয়ে নিয়েছিল। প্রপার্টি চোখে দেখে এরিনাও এক কথায় রাজি হয়ে যায়। সানফ্রানসিসকো থেকে ঘণ্টা দেড়েকের ড্রাইভ, জমির মাপ এরিনার পছন্দমত, বাড়ির কন্সট্রাকশন মন্দ নয়, ইমিডিয়েট রেনোভেশনের প্রয়োজন নেই। মূল বাড়ি ছাড়া একটা রিল্যাক্স হাউসও আছে, সেটাতে সিঙ্গল বেডরুম উইথ কিচেন এন্ড টয়লেট।

একটা গোলাঘর আর টুলরুমও আছে। এছাড়া আছে দুটো স্টল। তবে স্টল দুটো এখনও অবধি খালি। সোমনাথ মনে মনে ভেবেছে, স্টলে ঘোড়া নয়, দুটো গরু ভরে দিলে হয়, একেবারে সেই সুকুর গ্রামের মত। সম্প্রতি এমিলি আবদার জুড়েছে একটা ঘোড়ার জন্য, এরিনারও তাতে সায় আছে।

প্রচুর ফলের গাছ আছে প্রপার্টিতে, যদিও অত ফল খাওয়ার মানুষ নেই। প্রায় এক বিঘা জমি নিয়ে সোমনাথ আর এরিনা নিজেদের হাতে তৈরি করেছে কিচেন গার্ডেন। বাজারের ফল বা সবজী কোন কিছুই আর তাদের দরকার পড়ে না। জয় প্রফেশনে নার্স, কিন্তু ব্যবসা বুদ্ধি আছে ছেলেটার। গতবার এসে বাগানে ঘুরতে ঘুরতে বলেছিল, "আজকাল অরগ্যানিক সবজীর খুব চাহিদা, একজন হেল্পার রেখে আরও সবজীর চাষ করলে হয়, লোকাল ফার্মার শপগুলো ভালো দামে নিয়ে নেবে।"

জয়ের প্রস্তাব এরিনারও মনে ধরেছে। এরিনা উৎসাহ দিয়েছে ছেলেকে, "শুধু সবজী কেন, ফলও তো সব পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে, সবজী, ফল সবই আমরা সাপ্লাই করতে পারি।"

তবে মা-ছেলের আলোচনার মাঝে সোমনাথ ঢোকেনি। যদি জয়ের ব্যাবসার ইচ্ছে হয় করুক, নিজে খাটুক জমির পিছনে। সারাজীবনে সোমনাথ অনেক খেটেছে, তার সঞ্চয়ও মন্দ নয়, আর ক-বছরই বা বাকি আছে সোমনাথের জীবনে! এখন দিনগুলো সে নিজের মত করে বাঁচতে চায়, নিজের জন্য বাঁচতে চায়, অধিক সময় কাটাতে চায় নিজের সঙ্গে।

ধীরে ধীরে অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠেছে। সামনের আঙুর ক্ষেত আর পাহাড়িয়া মিশে গিয়েছে তমসায়। যেদিকে চোখ যায় অন্ধকার আর অন্ধকার শুধু, তার মাঝে এদিক ওদিক টিমটিম করে জ্বলছে কিছু আলো। মাঝে মাঝে ছলকে উঠছে আলোর ঢেউ, ওটা আসলে হুস করে যে গাড়িগুলো চলে যাচ্ছে দূরের রাস্তা দিয়ে, সেই গাড়িগুলোর হেডলাইটের আলো।

সোমনাথ ওঠে চেয়ার থেকে। পিছনের ডেক থেকে ফ্যামিলি রুমে ঢুকে দেখে, সোফার ওপর পা তুলে গুছিয়ে বসে এরিনা মনোযোগ সহকারে শব্দ ছক মেলাচ্ছে। শব্দ ছক মেলানো এরিনার বহু পুরনো নেশা। ইনফ্যাক্ট এই শব্দ ছক মেলানোর সূত্র ধরেই এরিনার সঙ্গে সোমনাথের আলাপ হয়েছিল প্রফেসর অ্যান্ড্রু গোল্ডস্টেইনের অফিসে। প্রফেসর অ্যান্ড্রুরও নেশা ছিল শব্দ ছকের। রিসার্চ পেপারের আলোচনার মাঝে টেবিলে হঠাৎ শব্দ ছকের পাজল উদয় হয়েছিল কেন কে জানে। তবে একটা শব্দে আটকে পড়েছিল প্রফেসর অ্যান্ড্রু আর এরিনা দুজনেই, কিছুতেই সঠিক উত্তরটা খুঁজে পাচ্ছিল না তারা। ঠিক সেই সময় ঘরে আবির্ভূত হয়েছিল সোমনাথ।

সোমনাথকে দেখে প্রফেসর অ্যান্ড্রু যেন হাঁফ ছাড়েন। অ্যান্ড্রু বলেছিলেন, "এই তো সোমনাথ, আমার নতুন পিএইচডি স্টুডেন্ট, ভেরি ইনটেলিজেন্ট। সোমনাথ, ক্যান ইউ সল্ভ ইট ?"

কী ভাগ্যি, তৃতীয় বিশ্বের ব্রাউন সোমনাথ ফট করে বলে দিয়েছিল সঠিক শব্দটা। এক মুহূর্তের জন্য প্রফেসর অ্যান্ড্রু আর এরিনা হাঁ হয়ে গিয়েছিল, অবাক হয়ে তাকিয়েছিল সোমনাথের দিকে।

সোমনাথ হেসে বলেছিল, "অত কিছু নয়, দু-শো বছর ইংরেজের দাসত্বের ফল।"

এরিনা জিজ্ঞাসা করেছিল, "মানে ?"

সোমনাথ বলেছিল, "ভারতবর্ষে দু-শো বছর ইংরেজ রাজত্ব করেছে। প্রথমদিকে কোলকাতা ছিল ব্রিটিশের রাজধানী। বাঙালী মাত্রই মানের মাপকাঠি হল ইংরিজী জ্ঞান। এমন এমন বাঙালী দেখেছি, যাঁদের পুরো কেমব্রিজ ডিক্সনারিটাই মুখস্থ।"

সোমনাথকে ভিতরে আসতে দেখে শব্দ ছক একপাশে সরিয়ে রাখে এরিনা। সোমনাথ জিজ্ঞাসা করে, "তোমাকে কথা বলতে শুনলাম, কে ফোন করেছিল ?"

এরিনার সামনে ছোট্ট কাঁচের টেবিলের ওপর একটা বেতের বাস্কেট রাখা, তাতে বাগান থেকে তোলা এক গুচ্ছ ফ্রেশ স্ট্রবেরি। একটা বড়সড় স্ট্রবেরি মুখে পুরে এরিনা বলে, "জুলি।"

"সামনে চারদিনের ছুটি। কবে আসছে জুলি ?" সোমনাথের গলায় ব্যগ্রতা।

এরিনা নির্বিকার মুখে বলে, "জুলি এই ছুটিতে আসছে না, মলয়ের সঙ্গে ভ্যাকেশনে যাচ্ছে ইয়েলোস্টোনে।"

মেয়ে ছুটিতে বাড়িতে আসছে না, বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে ভ্যাকেশনে যাচ্ছে শুনে সোমনাথ কিন্তু দমে যায় না, বরং দৃশ্যতই খুশি হয়।

সোমনাথ হাসি হাসি মুখে বলে, "মলয় জুলির তিন নম্বর। মলয়ের সঙ্গে জুলির সম্পর্কটা টিকে গেলে আই উইল বি ভেরি হ্যাপি। ছেলেটা খুব ভালো, অত নামী ইউনিভার্সিটি থেকে কোম্পানি 'ল' নিয়ে পাস করেছে।"

এরিনার চোখে চিকচিক করে হাসি, "আরও আছে, হি ইজ ইন্ডিয়ান, হিজ মাদার ইজ বেঙ্গলি। বাঙালী নিয়ে তুমি বড্ড বেশি অবসেসড সোমা, দ্যাট ইজ নট ফেয়ার। আচ্ছা, জয়ের ওয়াইফ যদি আমার মত ইটালিয়ান হয়, তখন কী করবে ?"

এরিনার প্রশ্নে এক মুহূর্তের জন্য থমকে যায় সোমনাথ, এরিনার চোখে চোখ রেখে বলে, "তাতে কী ! তোমাকে তো আমি নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছি। জয়ও তাই করবে।" তারপর কিছু মনে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে বলে, "সেই লাল পাড় সাদা গরদের শাড়িটা, যেটা মা তোমাকে দিয়েছিলেন, মলয়ের সঙ্গে বিয়ের পর সেই শাড়িটা জুলিকে দিয়ে দিও।"

এরিনা মাথা নাড়ে, "হোয়াই ? জুলিকে একটা নতুন কিনে দেব। বাঙালী মাত্রই লাল পাড় সাদা শাড়ি পছন্দ করে, মলয়ের মা-র কাছেও আছে নিশ্চয়ই। আমি একজন বাঙালীকে বিয়ে করেছি, আমারও একটা লাল পাড় সাদা শাড়ি থাকা উচিত।"

শ্বেতাঙ্গী মহিলা এরিনার পতি ভক্তি দেখে সোমনাথ হেসে ফেলে। অথচ এই হোয়াইট লেডিসদের সম্পর্কে তার ধারণা কত অন্যরকম ছিল। অভিজ্ঞতায় দেখেছে সোমনাথ, বাঙালী মেয়েও ভালোবাসা এবং বিবাহের ক্ষেত্রে কী প্রচণ্ড ক্যালকুলেটিভ হতে পারে। এরিনার সঙ্গে মিশে একটা ব্যাপার সোমনাথ বুঝেছে, জাত-পাত ওসব ফালতু, ইন্ডিভিজুয়াল ইজ মোস্ট ইম্পরট্যান্ট। ইটালিয়ান মেয়ে এরিনা অনেক দিয়েছে সোমনাথকে। তবু ভারতবর্ষের প্রতি, বাংলার প্রতি, অন্ধ পক্ষপাতিত্ব আজও তার গেল না।

এরিনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে সোমনাথ এসে দাঁড়িয়েছে ফ্যামিলি রুমের জানলার পাশে। আকাশের ঘন নীল জমিনে মিটমিট করছে লক্ষ লক্ষ তারা, ওক গাছের পাতার পিছনে আধখানা বাঁকা চাঁদ, একটা পাতলা আলোর চাদর গড়িয়ে পড়েছে প্রকৃতির গায়ে।

বাইরের দিকে চোখ রেখে সোমনাথ বলে, "আমার আর কী এমন অবসেসন। কবি কী বলেছেন জানো ? লেট মি ট্রান্সলেট আ পোয়েম ফর ইউ, 'আবার আসিব ফিরে'।"

বাংলা আর কবিতার প্রসঙ্গ উঠতেই সোমনাথের মস্তিষ্কে ধক করে ধাক্কা মারে ল্যান্সডাউন রোডের তিনতলা গোলাপি বাড়িটার স্মৃতি। হৃদয়ের পুরনো ক্ষতে গরম তেল ছিটকে পড়ে যেন। এত বছরেও ঘা শুকোলো না, ক্ষত সারলো না। অসতর্ক মুহূর্তে মনে পড়ে যায় কত ফেলে আসা ঘটনা।

পুরনো ক্ষতে ঘিয়ের প্রলেপ লাগাতেই এই র‍্যাঞ্চ প্রপার্টি কিনেছে সোমনাথ। অ্যামেরিকার বুকে মনের মত এক টুকরো সুকুর গ্রাম তৈরি করে নিয়েছে সে। যে সুকুর গ্রাম, সোমনাথের জন্মস্থান নিয়ে অপমান করেছিল সিদ্ধার্থ। আজও তার কানে বাজে সিদ্ধার্থর হিসহিসে কণ্ঠস্বর, "শালা চাষা, বামন হয়ে চাঁদ ধরার স্বপ্ন দেখছে!"

সেদিন ল্যান্সডাউন রোড থেকে হোস্টেলে ফেরার পথে সোমনাথ প্রতিজ্ঞা করেছিল, সিদ্ধার্থর দেওয়া 'বামন' বিশেষণের ঊর্ধ্বে একদিন সে উঠবে, উঠবেই। যতটুকু খোঁজ আছে, পাবলিক সেক্টরে আছে সিদ্ধার্থদা, ম্যানেজার র‍্যাঙ্কেই আটকে গিয়েছে। খুব অ্যালকোহল আর সিগারেটের অভ্যাস ছিল, তার থেকেই কীসব ক্রনিক কঠিন অসুখে ভুগছে। সোমনাথ নিজের মনে আওড়ায়, "আজ বামন কে সিদ্ধার্থদা ?"

তবে শাশ্বতীর খবর সোমনাথ জানে না, ইচ্ছে করেই রাখেনি। তবু শাশ্বতী রয়ে গিয়েছে তার হৃদয়ের গহীন কুঠুরিতে, আর শাশ্বতীকে উদ্দেশ্য করে লেখা কবিতারা ডায়েরির পাতায়।

সোমনাথের অন্যমনস্কতা এরিনা খেয়াল করে, তবে মুখে কিছু বলে না। এরিনা জানে সোমনাথের এই হঠাৎ-হঠাৎ ভাবের ঘরে হারিয়ে যাওয়া এক রোগ। এই সময় সোমনাথকে না ঘাটানোই মঙ্গল, খুব বিরক্ত হয়। শুধু সুকুর গ্রামের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেই সোৎসাহে গল্প শুরু করে দেবে বা পুরনো ডায়েরি খুলে কবিতা আওড়াবে।

এখন সোমনাথের দেশের বাড়ির গল্প বা পুরনো ডায়েরির কবিতা, কোনটাই শোনার ইচ্ছে নেই এরিনার। সে সোমনাথের মন ঘোরানোর চেষ্টা করে, "একটা ভালো খবর আছে সোমা। মনে হয়, হলিউডের চাকরিটা জুলির হয়ে যাবে।"

লস-এঞ্জেলসের ইউএসসি থেকে জুলিয়া ফিল্ম নিয়ে গ্র্যাজুয়েশন করেছে, হলিউডের কাজটা হয়ে গেলে সত্যি ভালো হয়। ফিল্ম লাইনে হলিউডের থেকে বেটার অপশন আর কী হতে পারে !

জানলার বাইরে থেকে চোখ ফিরিয়ে সোমনাথ তাকায় এরিনার দিকে, খুশি খুশি গলায় বলে, "বাহ, দারুণ খবর রিনা ! যাক, ছেলেমেয়েরা সবাই দাঁড়িয়ে গেল, এখন আমাদের শুধুই রিল্যাক্স করার সময়।"

সোমনাথের 'রিনা' সম্বোধনে এরিনা সোফা থেকে উঠে দাঁড়ায়। জানলার পাশে এসে আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়ায় সোমনাথের ঠোঁটে। সোমনাথ শক্ত করে জড়িয়ে ধরে এরিনাকে।

এরিনা মুখ তুলে বলে, "চলো, আজ একসঙ্গে শুতে যাই। কতদিন আমাকে আদর করনি সোমা।"

এরিনার এই নরম আত্মসমর্পণে অদ্ভুত এক মায়াময় জাদু আছে। সোমনাথের চোখে ভাসে কৃতজ্ঞতা, কিন্তু তার গলার স্বর ক্লান্ত শোনায়, "আজ নয় রিনা, আজ খুব ক্লান্ত আমি। এক পেগ বানিয়ে দেবে ? সঙ্গে কিছু বেকন আর সসেজও দাও।"

সোমনাথের প্রত্যাখ্যানে এরিনার চোখেমুখে কোনরকম রাগ, অভিমান বা অপমানের ছায়া পড়ে না। সে শুধু সামান্য ভুরু তুলে বলে, "ঠিক আছে। বাট নো মোর বেকন সোমা। লাস্ট চেকআপে তোমার ক্লোস্টেরল লেভেল হাই এসেছে।"

শাশ্বতীর সঙ্গে সোমনাথ যে প্রেম পাতিয়েছিল, তা নয়। মানে শাশ্বতীকে কোনদিনই সোমনাথ প্রপোজ করেনি। শাশ্বতী নিজে থেকে এসেছিল সোমনাথের কাছে, সোমনাথের দিক থেকে কোনরকম প্ররোচনা ছাড়াই। সোমনাথ তখন প্রতি সপ্তাহে যেত ল্যান্সডাউন রোডের তিনতলা গোলাপি বাড়িটাতে, সঙ্গে থাকতো নিজের লেখা কবিতার খাতা। সেসব কবিতা এডিট করে দিত সিদ্ধার্থদা। খুব কপাল ভালো হলে বেছে বেছে দু-চারটে কবিতা লিটল ম্যাগাজিনের জন্য সিদ্ধার্থদা নিয়েও নিত।

নিজের লেখা কবিতা ছাপার অক্ষরে ম্যাগাজিনের পাতায় দেখা, সেসব ছিল রোমহর্ষক ঘটনা। উপরি পাওনা ছিল সিদ্ধার্থদার বোন, শাশ্বতী। প্রায়ই ডিক্সনারির খোঁজে শাশ্বতী ঢুকে পড়তো সিদ্ধার্থদার ঘরে, বা চা দেওয়ার সময় অসাবধানে আঙ্গুলে আঙ্গুল ছুঁয়ে যেত। সিদ্ধার্থদার ঘরে প্রয়োজনের চাইতে দুদণ্ড বেশি দাঁড়াত শাশ্বতী, কথায় কথায় হাসত। শাশ্বতী যত হাসত, সোমনাথের মাথায় তত দ্রুত শুরু হয়ে যেত কবিতার শব্দদের হাইড এন্ড সিক গেম।

অধরা শব্দরা ধরা দিত রাতের আঁধারে। হোস্টেল রুমে সোমনাথ তখন একা, জানলা দিয়ে এক ফালি চাঁদ ঢুকে গা এলিয়ে দিয়েছে সোমনাথের বিছানায়। চাঁদ আর শাশ্বতীর রূপ কখন যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত সোমনাথের মনে, কবিতার ছত্রে।

শাশ্বতীর সঙ্গে সোমনাথের অফিসিয়াল আলাপ হয়েছিল সিদ্ধার্থদার জন্মদিনে। ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে ড্রয়িংরুমে অতসীদির পাশে বসে ছিল সোমনাথ, সামনে এসে দাঁড়ায় শাশ্বতী। অতসীদি আলাপ করিয়ে দিয়েছিল, "ভেরি ব্রাইট বয়, লম্বা রেসের ঘোড়া, আমাদের সোমনাথ জীবনে বহুদূর এগোবে।"

অবশ্য সোমনাথের প্রতি অতসীদির প্রশংসা শুনে শাশ্বতীর মুখে তেমন কোন ভাবান্তর হয় না।

তবে সিদ্ধার্থদার জন্মদিনের পর কোন এক অজ্ঞাত কারণে ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে সোমনাথের যাতায়াত প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মানে সিদ্ধার্থদাই আর আগের মত ঘন ঘন বাড়িতে ডাকতো না। তাদের কবিতার আসর বসতো ইউনিভার্সিটির লনে, বিকেল পাঁচটার পরে।

হঠাৎ একদিন শাশ্বতীর সঙ্গে সোমনাথের দেখা হয়েছিল চুয়াল্লিশ নম্বর বাসে। সেখান থেকে আলাপটা গড়িয়েছিল, আপনি নেমে এসেছিল তুমিতে। তারপর সেই অপ্রত্যাশিত কাণ্ড, শাশ্বতী সশরীরে হাজির হয়েছিল সোমনাথের হোস্টেল রুমে।

থার্ড-ইয়ারের মাঝামাঝি তখন, বিচ্ছিরি রকমের ম্যালেরিয়া হয়েছিল সোমনাথের। যে সে ম্যালেরিয়া নয়, একেবারে ব্রেন ম্যালেরিয়া। পরপর দু-সপ্তাহ সোমনাথের সঙ্গে দেখা হয়নি শাশ্বতীর। সময়টা ছিল দুপুর। ফাঁকা হোস্টেল। অধিকাংশ ছাত্রই কলেজে। সোমনাথের জ্বর রেমিশন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু শরীরে তখনও অসহ্য ক্লান্তি। সকালে দুটো ক্লাসের পর আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস ছিল না। তাই ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে এসে হোস্টেল রুমে সোমনাথ বিছানায় শুয়ে ছিল। ঘরের দরজা ছিল ভেজানো। হঠাৎ ভেজানো দরজা ঠেলে ছেলেদের হোস্টেলের ঘরে ঢুকে এসেছিল এক জলজ্যান্ত নারী, শাশ্বতী।

শাশ্বতীকে দেখে সোমনাথ পুরো হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। শাশ্বতী কিন্তু সপ্রতিভ। টেবিলের ওপর কাঁধের ঝোলাব্যাগটা নামিয়ে রেখে এগিয়ে এসেছিল সোমনাথের বিছানার পাশে। জ্বর পরখ করতে হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখেছিল সোমনাথের বুক, কপাল।

আচ্ছা, এটা একটু বাড়াবাড়ি না ?

সোমনাথের খটখটে শুকনো বুকে শাশ্বতীর মত এক টুকরো লাভা এসে পড়লে অগ্নিকান্ড না হয়ে কি হরিনাম সংকীর্তন হওয়ার কথা!?

তাও সোমনাথ হাত বাড়ায়নি, শাশ্বতীই মেলে ধরেছিল নিজেকে। তার লাল টুকটুকে ঠোঁট দুটো এগিয়ে ধরে বলেছিল, "কিস মি সোমনাথদা, আমি পুড়ে যাচ্ছি, খুব যন্ত্রণা জানো।" সোমনাথও তো মানুষ !

সোমনাথকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরেছিল শাশ্বতী। জলজ্যন্ত নারী শরীরের তাপে পুড়তে পুড়তে ভ্যাবলা সোমনাথ দেখেছিল শাশ্বতীর বাঁ-দিকের স্তনে একটা লাল জড়ুল। সেই লাল জড়ুল সোমনাথের মাথায় গেঁথে গিয়েছে সারা জীবনের মত, মৃত্যু অবধি তা আর ভোলার নয়।

সোমনাথকে শাশ্বতী জড়িয়ে ধরেছিল কেন ? সোমনাথের প্রতি আগ্রাসী ভালোবাসায় নাকি যৌন তাপ প্রশমনের খোঁজে ?

সত্যি, এই যে জুলি, মিলি, জয় বা তাদের বন্ধুবান্ধবদের কুড়ি বছর বয়সে শরীরী চাহিদা পূরণের জন্য তো বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয় না, বা কোনরকম স্থায়ী সম্পর্কের বাঁধনেরও প্রয়োজন পড়ে না। শরীর শরীরের জায়গায়, মন মনের মত। তবে যস্মিন দেশে যদাচারেৎ। সুকুর গ্রামের সোমনাথের কাছে যৌবনের মূল্যবোধ ছিল অন্যরকম। আগে মন, পরে শরীর। মন ছাড়া এই পোড়া শরীরে আর আছে কী !

শাশ্বতীও ভারতীয় মূল্যবোধে বড় হয়েছে। সিদ্ধার্থদাদের পরিবার রীতিমত গোঁড়া। সেই পরিবারের মেয়ে হয়ে শাশ্বতী ভালোবাসা ব্যতীত অত সহজে শরীর দিল কি করে ?

এই প্রশ্নটাই আজও কুরে কুরে খায় সোমনাথকে। সোমনাথের সঙ্গে শাশ্বতীর সম্পর্কের বিরুদ্ধে যে পারিবারিক প্রতিরোধ এসেছিল, তা মোকাবিলা করতে শাশ্বতী কি অক্ষম ছিল ? নাকি বাবার ঠিক করে দেওয়া সরেস পাত্র দেখে শাশ্বতী নিজেই কেটে পড়ার তাল মেরেছিল ? শাশ্বতীর পাশ থেকে সোমনাথকে খেদিয়ে দেওয়ার ঘটনায় সিদ্ধার্থদা ছিল ক্যাটালিস্ট মাত্র !

শাশ্বতীর সঙ্গে বিচ্ছেদ মানে শুধু প্রেমে প্রতারণা নয়, সিদ্ধার্থর ব্যবহারে খুব আঘাত পেয়েছিল সোমনাথ। সিদ্ধার্থকে সোমনাথ ভালোবাসতো নিজের দাদার মত। সোমনাথ সম্পর্কে সেই সিদ্ধার্থদা মনে মনে এত নীচ ধারণা পোষণ করে জেনে সোমনাথের শরীরে যেন অপমানের আগুণ ধরে গিয়েছিল।

অনেকক্ষণ হল এরিনা শুতে চলে গিয়েছে। ফ্যামিলিরুমের সোফায় আধশোয়া হয়ে বসেছিল সোমনাথ। সামনে টিভি চলছিল লো-ভল্যুমে। গ্লাসের তলানি স্কচটুকু একবারে গলায় ঢেলে দেয় সোমনাথ। গ্র্যান্ডফাদার ক্লকে বারোটা বাজে ঢং ঢং করে।

সোমনাথ সোফা থেকে উঠে দাঁড়ায়। আর দেরি নয়, এখনই শুয়ে পড়া দরকার। এ বাড়িতে দিনের সময়সীমা রাত বারোটা। তারপর সোমনাথ ঘুমোতে গিয়েছে টের পেলে এরিনা খুব রাগ করবে। আর এরিনার স্নিগ্ধ শান্ত চেহারায় রাগ একদম মানায় না।

(চলবে)

স্বপ্না মিত্র একজন প্রবাসী বাঙালি। বিজ্ঞানের ছাত্রী। রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে রেডিও-ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স নিয়ে বি-টেক করে বেশ কিছুদিন দেশি এবং বহুজাতিক সংস্থায় কাজ করেছেন। চিরদিনই হার্ডকোর হবি ছিল রিডিং, লেখালেখি ছিল একান্তই ব্যক্তিগত ভালোবাসার জায়গা। ইদানীং বেশ কিছু লেখা আত্মপ্রকাশ করেছে প্রিন্টেড ম্যাগাজিনে (দেশ, সানন্দা, সাপ্তাহিক বর্তমান, বর্তমান, আনন্দমেলা, বাংলা ফেমিনা, আনন্দবাজার, আজকাল), বিভিন্ন ওয়েব ম্যাগাজিনে এবং বই হিসেবে।

অভিজিৎ মুখার্জী

একটি চুরির গল্প

(একটি একাঙ্ক নাটক, অভিনয়ের সত্ব সংরক্ষিত)

(বাঁ দিকের স্টেজ মৃদু আলোকিত। কলকাতার নব্বই দশকের মধ্যবিত্ত সংসারের একটি বসবার ঘর, সোফা, আলমারী, ফোন, টিভি, খোলা জানলা দিয়ে বাইরের ঘন অন্ধকার দেখা যাচ্ছে। একটি সুঠাম শরীর, কালো বডি স্যুট, মুখে কালো মুখোশ পরা, দেখা গেল। সে গ্যাস কাটার দিয়ে জানলার গারদ মুহূর্তের মধ্যে কেটে ফেলে, নিঃশব্দ পায়ে ভেতরে এলো। সেই মুহূর্তে ঘরের টেলিফোন টা বেজে উঠল। শরীর দ্রুত টেলিফোনটা তুলে নিল। চাপা গলায়)

— হ্যালো

(সেই মুহূর্তে স্টেজের অন্য অর্ধ আলোকিত হল। IT অফিস এক যুবতি তার কাজের টেবিলে বসে, পেছনে আমেরিকার পতাকা, কানে হেড ফোন। কিছুটা অনিশ্চিত ভাবে দাঁড়িয়ে উঠল।)

— হ্যালো, হ্যালো

(বাঁদিকে চুপচাপ, কিছুটা কাঁপা গলায়) yes এটা কি 22150012 ? (অনিশ্চিত হয়ে) হতে পারে কি বলছেন, কি 'হতে পারে' ? এটা কি রণেন চ্যাটার্জীর বাড়ি ? হতে পারে, মানে হ্যাঁ আপনি কে বলুন তো ?

আমি, আমি মানে ঐ অতিথি বলতে পারেন।

— অতিথি ? কেমন অতিথি যে মালিকের নাম জানেনা ?

— আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন ?

— শিকাগো

— ওঃ শিকাগো, (নিশ্চিন্ত হয়ে) সেতো অনেক দূর, তাহলে সত্যিটা বলা যায়। আপনি কিছু করতে পারবেন না।

— কি আবোল তাবোল বকছেন ? আপনার মাথার ঠিক আছে ?

— হ্যাঁ রে বাবা হ্যাঁ, আমি পাগল হতে যাব কেন ? আমি just একটু চুরি করতে এসেছিলাম আর কি।

— (Yelling) চোর চোর, আমাদের বাড়িতে চোর ঢুকেছে, পুলিশ পুলিশ, ও মা এখন কি হবে ? মা বাবা চোর ঢুকেছে চোর . . .

— চোর কথাটা প্রথম শুনলেন নাকি ? এত চেল্লাবেন না তো কানের পোকা মেরে দিল !

— না না আপনি আমার সঙ্গে মজা করছেন। আপনার ভাষা শুনে তো মনে হয়,

— ওহ ভাষা ? আপনার চোর সম্বন্ধে তো খুব খারাপ ধারণা তাই না। (চোর মুখোশ খুলতেই তার যুবতি মুখ দেখা গেল) শুনুন, এই মাত্র জানলার গরাদ কেটে ঢুকলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে আপনার ফোন। ভেবে দেখুন এমন ঝক্কির কাজ, এই সময় কি জ্বালাতন। বুদ্ধি খাটিয়ে ফোনটা তুলে নিয়েছি তাই রক্ষে।

— ওরে বাবা, আমার পেটের ভেতর সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে, ও মা এখন আমি কি করি ? বাড়িতে চৌওওর (কান্না)

— নাকে কাঁদবেন না তো, আমার এদিকে এত রিস্ক আপনার কাছে ছুরি টুরি কিছু নেই তো, পিস্তল টিস্তল ?

— নাঃ। ও সব আমার লাগে না। ও সব রাখলে চালাতেও ইচ্ছে করবে। স্ক্রিনের দিকে দেখে, নম্বরটা তো আমাদের বাড়ির, আপনি বাড়ির নম্বরটা বলতে পারবেন ? 34/9

— এ সব কি প্রশ্ন ? আসার সময় ওটা দেখা হয়নি, দরজায় নেমপ্লেট ? রণেন চ্যাটার্জী ?

— ন্যাকামি, আপনার কি মনে হয় ? আমি দরজার বেল বাজালাম আর আপনার বাবা আমাকে আপ্যায়ন করে বসালেন ? বললাম না জানলার গরাদ কেটে ঢুকেছি। জানলায় কি নেম প্লেট লাগানো থাকে ?

— সরি, একটা request করব ? প্লীজ বলে ফেলুন, অতো ভনিতা আমার ভাল লাগে না।

— আপনি যখন এত কষ্ট করে বাড়িতে ঢুকেছেন তখন কিছু একটা তো নেবেনই।

— শুধু আমার মা বাবার কোনো ক্ষতি করবেন না, প্লিজ। আমার একটা ছোট বোনও আছে। ওদের মারবেন না। আপনার যা মন চায় নিয়ে যান।

— কিন্তু, ওরা যদি উঠে পড়ে ? আমাকেও তো বাঁচতে হবে। নাকি আপনাদের মনে হয় চোরদের বাঁচার অধিকার নেই ?

— তা কেন, তা কেন ? আপনার safety তো চাই, আপনাদের মত হাই ক্লাস লোকেদের কোনো সেন্স থাকে না।

— আচ্ছা, আপনি ফোনটা রাখবেন না। ওরা যদি উঠে পড়ে আমায় কথা বলতে দেবেন। আমি ওদের বলব আপনি আমার বন্ধু।

— বাড়িতে কুকুর টুকুর নেই তো ? চাকর বাকর ? ভাই টাই ?

— না না আর কেউ নেই। আমরা দুই বোন।

— হুঁ, small family।

— আপনার বুঝি large family ?

— ছিল, এখন no family।

— বিয়ে করেননি ? ছেলে পুলে ? হুঁ নিজের পেটই চলে না তার আবার ছেলে পুলে।

— তাই, আমাদের দেশে hunger খুব, malnutrition যান যান, আপনারা কি বুঝবেন? আপনাদের দেশে তো ঐ কি সিটি ? ওবেসিটি।

— তা ঠিক, মানুষ junk food খেয়ে অসুস্থ।

— গরম কুত্তা, hummingbird

— গররম কু. . . ওহ Hotdog Hamburger, হা হা

— আপনিতো অনেক জানেন !

— আমরা কি অশিক্ষিত ? আজকাল সবাই জানে

— আপনি কি করেন, পড়াশোনা না চাকরি ?

— দুটোই, Part time masters আর একটা কোম্পানীতে Internship ।

— ভালো ভালো, এটা তো Information age ।

— বাবা ঃ, আপনি সত্যিই অনেক জানেন ।

— আপনারা তো সব চোরকে নিরক্ষর ভাবেন । Class divide ।

— না না, আপনি অন্য চোরদের মত নন । আচ্ছা, যেকটা চোরের সঙ্গে আপনার দোস্তি আছে ? তারাতো সব কোট প্যান্ট পরা ।

— আচ্ছা, আপনি কি দেয়ালে গর্ত করে ঢুকলেন ?

— আরে অত সময় কার আছে ? আমরাও Modern হচ্ছি । সিধে জানলায় গ্যাস কাটার চালিয়ে দিলাম ।

— Right , একটা না প্রবলেম আছে ।

— কি ?

— আমাদের ঘরে টাকা পয়সা, সোনা দানা কিচ্ছু নেই । সব ব্যাঙ্কে ।

— না এটা আপনাদের খুব অন্যায় । জানেন লকার থেকে কত সোনা দানা লোপাট হচ্ছে ? ওখানে কোনো গ্যারেন্টি আছে ?

— ঠিক, কিন্তু বাবা বোঝে না । ব্যাঙ্ক অফিসার ছিল তো । দাঁড়ান, আমি জানি মার ভান্ডার কিচেনে ডালের কৌটোর থেকে কতবার সরিয়েছি ।

— কত বিশ ত্রিশ ?

— বেশি শ, দুশো ।

— এঁ, শ দুশো দেখাচ্ছেন । আপনি আমায় কি ভিখারি ভেবেছেন ?

— দাঁড়ান, আপনার কাছে টর্চ আছে ?

— আছে, তবে আমরা ওটা ব্যবহার কমই করি ।

— শোবার ঘরে আলমারিতে, নিচের তাকে আমাদের অ্যালবাম । সবুজ রঙের । অ্যালবামটার মধ্যে বাবা হাজার দুহাজার টাকা রাখে ।

— ছ্যা, আপনার বাড়িতে দামি জিনিসপত্র নেই ? এত বড় বাড়ি দেখে ভাবলাম ভালো কামাই হবে ।

— আছে, আলমারির পাশের তাকে আমার ক্যামেরা, handycam আর DVD player ।

— ম্যাডাম, ওসব জিনিসের কোনো resell value আছে ? chinese মালে তো বাজার ছেয়ে গেছে । সত্যি, আপনি সব জানেন ।

— আমরা ছাড়া second had market এর খবর আর কে রাখবে ? (ঘড়ি দেখে), দু'টো আমার সময় চলে যাচ্ছে । আপনার ওখানে তো বিকেল তিনটে ।

— অ্যাঁ, আপনি শিকাগোর লোকাল টাইম জানেন ?

— কেন ? আমারা কি ঘড়ি দেখতে পারিনা ?

— না তা নয়, কিন্তু আপনি একটা টার্গেট করে এসেছেন।

— না তেমন কিছু নয়, তবে আমি অমন ছিঁচকে চোর নয় যে এঁটো কাঁটা দিয়ে পার পাবেন।

— বাড়িতে antic কছু আছে ?

— Antic , না আমার তো জানা নেই। বাবার কাছে শুনেছি ঢাকার বাড়িতে ছিল, কড়ির মেম, জার্মান ঘড়ি, ফ্রেঞ্চ কাঁটা চামচ . . .

— ঢাকা, আপনারা ঢাকার লোক ?

— হ্যাঁ, তবে partition এর আগেই . . .

— আমরাও কিন্তু ঢাকা শহর থেকে ৫০ মাইল দূর।

— বাহ, কি ভালো।

— ভালো কিছুই নয়। আমরা ওখানেও গরিবই ছিলাম। আপনারা তো বড় ঘরের।

— তেমন ধনি নয়, কিছু জমি জায়গা, কয়েকটা দোকান . . . দেশ ভাগের সময় সব চলে গেছে।

— আপনি গেছেন ?

— না, আমার বাবার জন্মের আগেই ওরা চলে আসে।

— কত বয়স ওনার ?

— ৫৭, কেন ?

— আমার বাবার বয়স হত ৫৫

— চলে গেছেন ?

— গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে পড়াতেন, যাদের যত কম থাকে, তাদের ছাড়তে তত কষ্ট হয়। অনেক দেরি করে, অসুস্থ হয়ে এদেশে এসেছিলেন চিকিৎসার আশায়। পেলেন না।

— আর আপনি এই লাইন এ ?

— কেন ? আমার আয় কত জানেন ?

— কিন্তু লাইনটা তো . . .

— যে দেশের একশর মধ্যে আশিটা চোর। যে দেশের মানুষ ভোট দিয়ে চোরদের সরকার গড়ে দেয় সে দেশে এর থেকে ভালো আর কি আছে ? বাবা গ্রামের স্কুলের মাস্টার, বেতন একশ তাও অনিয়মিত, কোন টিউশন নেই। তাও ওনার মৃত্যু তো অবধারিত।

— আর আপনার ?

— আপনার কিরকম জানিনা, তবে আমার ঘরে বাইক, ফ্রিজ, টিভি, মাইক্রোওএভ । ফ্ল্যাট এর emi দিই আমি । আর একটা জিনিস যা আপনার ও নেই, রান্নার মাসি ।

— যাঃ সত্যি ? আপনিতো পুরো established ! আমার এখনো অনেক দিন লাগবে । আপনার জ্ঞানও অসাধারণ ।

— জ্ঞান বলবেন না, প্রফেশনাল ইনফর্মেশন বলতে পারেন ।

— আপনি তো আমায় মুশকিলে ফেলে দিলেন । আমাদের বাড়িতে কেন ?

— এটা শো এর যুগ । এখন ইন্টারনেট থেকে দু পাতা পড়ে যে কেউ জ্ঞানী হয়ে যায় ।

— তাও, আপনার যোগ্য আমাদের কাছে কি আছে তাই ভাবছি ।

— আছে, আমি খবর না নিয়ে আসিনি ।

— কি ?

— Patek philippe Nautilus watch, 1818 or19 মেক, ।

— ও হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, আমার বড় দাদু, উনি দাদুকে দিয়ে যান, দাদু বাবাকে । মজার কথা এখনও ঘড়িটা চলে । বাবা রোজ দম দিতে ভোলে না । আপনি কি করে . . .

— আমাদের নেট ওয়ার্ক আছে ।

— বাহ্, আপনি কি ভীষণ organised ।

— ম্যাডাম, এযুগে সব crimeই cyber crime । আপনার বাবা একটা blog লিখেছিলেন । google search এ এলো ।

— তার মানে আপনি আমাদের সব খবর জানেন । তবে কেন বললেন যে আমাদের বাড়ির নম্বর জানেন না ?

— সাবধানের মার নেই ।

— ওটা হলে চলবে ?

— এখনকার মতো চলে যাবে । ৪-৫ লাখ ।

— যাহ্, কে অতো টাকা দেবে ঐ আমাপাড়া ঘড়ির জন্য ?

— collector, কোম্পানী নিজের লোক পাঠায় ।

— বাবাঃ, এরকম জ্ঞান এখানকার ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েটদের নেই । বিশ্বের খবর আপনার কাছে ।

— আমি আদার ব্যাপারি বিশ্বের কোন জাহাজ কোথায় যায় তা জানিনা ।

— তা আপনার কম্পিউটারও আছে !

— পুরনো, জোড়াতাড়া লাগানো ।

— ল্যাপটপ ?

— না, তবে ঘড়িটা পেলে হয়ে যাবে।

— বাবার মাথার কাছে যে টেবিল তার ড্রয়ারে থাকবে।

— এই তো লক্ষ্মী মেয়ের মত কথা।

— কিন্তু ড্রয়ারে তালা লাগানো।

— আপনি তো ওদেশে থাকেন, কতক্ষণ লাগে চোরদের গাড়ির বুট খুলতে ?

— ও মা, আপনি কি এখানেও এসেছিলেন নাকি ?

— সে খবরে আপনার কি ?

— বাবার ঘুম বড় পাতলা, খুট আওয়াজেই জেগে যায়। ফোনটা ওনাকে দেবেন প্লীজ যদি উঠে পড়েন।

— Ok

— লক্ষ্মীটি কোনো ঘুমের ওষুধ স্প্রে করবেন না। ওনার পেস মেকার আছে।

— আপনি বাবাকে খুব ভালোবাসেন না।

— সবার থেকে বেশি।

— খুব ভাল, বিয়ে করে বাবা মাকে ভুলে যাবেন না। ওনার কাছে বন্দুক টন্দুক নেইতো ? পুরোনো বনেদি ঘর।

— আছে।

— আছে। আর এতক্ষণ আপনি চেপে রেখেছেন।

— ওটা আলমারিতে তালা বন্ধ।

— তাহলে আর রেখে কি লাভ ?

— বিয়ের পরে মা বলল হয় আমি নয় তোমার বন্দুক একটা বিছানায় যাবে।

— বেশ বেশ, কুকুর ?

— ছিল চকো, চকোলেট labrador। আমার সঙ্গেই বড় হল, তারপর একদিন চলে গেল। আমি এখানে চলে এলাম, মা বলল, আর নয় বড় মায়া পড়ে যায়।

— এখন আমি নিশ্চিন্তে যেতে পারি। কিন্তু বাথরুম থেকে একটা শব্দ আসছে।

— তাহলে ?

— ভাববেন না, আমাদের পেশায় ধৈর্য্যটাই আসল। বয়স্ক মানুষ, ঘুম আসতে সময় লাগে।

— না উনি ঘুমের ওষুধ খান।

— সে তো ভাল নয়, ড্রাগ dependence হয়ে যেতে পারে।

— কি আর করতে পারেন ?

— হাঁটুন, দারুন কাজ করে।

— হার্টের জন্য তাও মানা।

— যোগ ব্যায়াম, আমি শেখাতে পারি।

— (এক সাদা পুরুষ আসে ডান অর্ধে)

— Hi sweetheart, care for a coffee ? Thanks Bob, I guess not.

— ওটা কে? আপনাকে sweetheart বলল ?

— হাঁ, কল আসছে, জানিয়ে গেল।

— তাহলে তো এবার রাখতে হয়।

— নানা, এই কাজে খুব একটা মন লাগে না।

— ববের সঙ্গে আপনার ?

— না না পাগল ? ওর পেটে যত ফ্যাট মাথায় তার দ্বিগুণ। এখানে সবাই সবার sweetheart।

— অন্য কোনো বয়ফ্রেন্ড ?

— নাঃ, আমার জন্য কুলের আচার খেতে খেতে উত্তম-সুচিত্রা দেখা ছেলে চাই।

— আপনার কি পছন্দ ? গরাদ পালোয়ান ?

— না না, আমার দিক থেকে এগিয়েছিলো কিছুটা, তারপর . . .

— আহা কি হল ?

— এক মিনিট, বাথরুমে লাইট এখনও অন।

— ওনার prostate প্রবলেম আছে। আপনার গল্প শেষ হয়ে যাবে।

— তেমন কিছু না, যেমন সব গল্প হয়। একতরফা।

— আমাদের মত ঢ্যাঙা মেয়েদের আর কোন ছেলে পছন্দ করবে ?

— আপনি কি করে জানলেন ?

— মুখভর্তি দাগ, না নাচতে জানি না গাইতে। সব পুরুষ আমাকে কেমন ভয় ভয় করে।

— অনেক ফুটেজ খেয়েছ মা, এবার কাহিনিটা শুরু কর।

— আমার চেহারাটা তুমি দেখনি, তাই বলে রাখলাম । বুঝতে সুবিধে হবে । আমি trekking থেকে ফেরত আসছিলাম, হিমাচল এক্সপ্রেস । ও বাবা মাকে নিয়ে, দিল্লি থেকে । কেমন একটা লাজুক চাহনি, না সুন্দর না শক্তপোক্ত, জাস্ট একজোড়া গভীর চোখ । আমার পাহাড়ের কাহিনি শুনে আর ছবি দেখে ওর বাবা তো মুগ্ধ । উনি গিয়েছেন, পিন্ডারি, হোমকুন্ড, গোমুখ . . . সব বিয়ের আগে, তারপর ২৫ বছর আর সুযোগ হয়নি । বাবা যত কথা বলে ছেলে তত মুখ ফিরিয়ে জানলা দেখে । কুৎসিৎ হলেও আমি মেয়ে তো ! একবার মুখ ফেরাতেও তো পারে । ওর মাও কেমন চুপচাপ । হিমালয়ের গহন গভীর রূপ বর্ণনা করতে করতে আমার ভিতর একটা গ্লেসিয়র গলে নদী হয়ে যাচ্ছিল । ঐ বাঁটকুল রসগোল্লা মার্কা ছেলেটা আমার এতদিনের পুষে রাখা সব ধারণা কেমন গুলিয়ে দিচ্ছিল । ''রসগোল্লা খাবে ? দিল্লির চিত্তরঞ্জন থেকে কেনা ?'' ওর বাবার অফারটা ওর মার কঠিন দৃষ্টির সামনে না বলতে হল ।

— ওহ রসগোল্লা । কতদিন KC Das খাইনি । এখনকার গুলো মনে হয় তুলো ঠুসে দিয়েছে ।

— হুঁ, বিদেশে খাবার বড় কষ্ট ।

— ওসব আমি বুঝব, এখন আপনি আবার ঠাকুরমার ঝুলি থেকে গল্পটা বার করুন । নাম ?

— সমু সৌম্য, কিন্তু সমুটাই বেশি মানানসই ।

— তোমাদের জোড় বড় মজাদার ।

— মজা ! ও তো এই ধিঙ্গিকে একবার দেখতেও চায় না । কিন্তু একটা অ্যাক্সিডেন্ট সব বাঁধা ঘুচিয়ে দিল ।

— অ্যাক্সিডেন্ট, ও কি মিষ্টি, বলো বলো ।

— মিষ্টিই বটে, ওদের টিকিটটা সমুর কাছে ছিল । ও সেটা সন্দেশের বাক্সর রবার ব্যান্ডের সাথে লাগিয়ে রেখে ছিল । বাক্সটা খালি দেখে ও জানলা দিয়ে ফেলে দিল । তারপর চিৎকার, ও মা আমি টিকিটটা ফেলে দিলাম । ততক্ষণে ট্রেন স্টেশন ছেড়ে স্পিড নিচ্ছে । আমি ট্রেন থেকে ঝাঁপিয়ে লাগালাম দৌড় । পাহাড়ের পাথর গুলোর মত লাফ দিয়ে টপকে গেলাম একটা একটা স্লিপার । বাক্সটা থেকে খুলে নিলাম টিকিট আর এক লাফে আবার ট্রেনে ।

— তো তুমি একেবারে instant স্টার, না হিরো বলো ।

— তেমন কিছু না, তবে এবার মাতাজির মন গলল । পুরো রসগোল্লার হাঁড়িটা আমায় অফার করে দিলেন । সমুও মিন মিন করে কিছু একটা বলেছিল । তারপর ওদের বাড়ি যাওয়ার নেমন্তন্ন পেয়ে গেলাম ।

গেলে ?

— আর কোনো উপায় ছিল ? ট্রেনের সম্পর্ক ট্রেনেই শেষ হয় । কিন্তু ঐ সরল চোখদুটো আমার কাল হল । কদিন এদিক ওদিক করে কাটল । তারপর এক বিকেলে সোজা হাজির হলাম । কত্তা গিন্নি বড় যত্ন করে বসালেন । চা মিষ্টি, সমু ইউনিভার্সিটিতে ছিল । PhD করছিল । বুঝলাম আরও বছর দু এক আমাকেই টানতে হবে । তাতে ওকে আরও ভালবেসে ফেললাম ।

— তখনও কি তুমি এইরকম . . .

— চুরি ? না, একটা ব্যবসা শুরু করেছিলাম । Partnership, আমার লেবার, আর অন্যের পুঁজি । পাড়ায় কানাইদার গুঁড়ো মশলার ব্যবসা । ব্যস, SK Organics খুলে ফেললাম, হোটেল রেস্টুরেন্টে সাপ্লাই করতে লাগলাম । এই ব্যবসায় মহিলাদের লোকে বেশি বিশ্বাস করে ।

— চলল ব্যবসা ?

— দুবছরে বিশ লাখ রোজগার, পাঁচটা সাব এজেন্ট ।

— আর সমু ?

— শশশ, বাথরুমের আলো নিভেছে । তোমার বাবাটি এবার বোধহয় ঘুমোলেন । এখনও দশ মিনিট । চুপটি করে গল্পটা বলতো খুকি ।

— আমাদের সোসাইটির নাইট গার্ড কিন্তু ভীষণ সজাগ ।

— গেলাম আরও কয়েকবার, চা মিষ্টি মিলল, কিন্তু মিষ্টি ছেলেটি আমাকে এড়িয়ে চলে । শেষ পর্যন্ত ইউনিভার্সিটি গিয়ে ডেকে বসালাম একটা কাফেতে ।

— উম উম উম, তারপর ?

— তোমার কি মনে হয় ?

— রোমান্টিক কিছু ? এসেই বলল আপনি আমাদের বাড়ি কেন আসেন আমি জানি । কিন্তু আমাদের ম্যাচ ঠিক নয় । ও PhD শেষ করে বিদেশ যেতে চায় , আমার হাতে তো সেই টিকিট নেই ।

— পাষাণ, অসভ্য ।

— আমি ব্যবসা পত্র লাটে তুলে বেরিয়ে পড়লাম পাহাড়ে পাহাড়ে ।

— কেন ?

— একটা সাংঘাতিক ভয়ঙ্কর কিছু না করলে যেন আমার মন শান্ত হবে না । মাস খানেক পরে মনে হল আমাকে একটা ভীষণ রিস্কি কিছু করতে হবে, যাতে রোজ একবার করে মরে যেতে পারি । ব্যস শুরু করলাম নতুন ব্যবসা ।

— চুরি ?

— Antics । আমি antics smuggler । প্রচুর জালি মাল তার থেকে আসল রতনটি চিনে নিতে হবে ।

— মেয়ে স্মাগলার ?

— এসব ব্যবসায় মেয়েদের স্পেশাল advantage, বিশ্বাস বিশ্বাস । কিন্তু রিস্কও আছে যে বন্দুক কিনতে গিয়েছিলাম সেটা দিয়েই গুলি চালিয়ে দিল ।

— ও মা, কী সাংঘাতিক ।

— কিন্তু আমি চুরি করতে যাই নি । দর করতে গিয়েছিলাম । বুড়োটা দর শুনে রেগে গিয়ে গুলি করে দিল ।

— এমন কাজ ছেড়ে দাও ।

— রিস্ক কোথায় নেই ? আমেরিকাতে IT ইন্ডাস্ট্রিতে sexual harrasment এর কেস কত হয় ?

— তো তুমি হচ্ছ antics dealer ।

— বলতে পার, বেশিরভাগ আইটেম আমি কিনেই নিই। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে যে এই ব্যবসায় সঠিক দাম কেউ জানেনা। অনেক সময় মালিকেরা খুব উঁচু দর হেঁকে বসে। তখন বাধ্য হয়ে আমাকে অন্য পথ দেখতে হয়।

— তাই বলে চুরি ?

— হ্যাঁ।

— (একটু চিন্তা করে) কিন্তু তুমিতো আর পাড়ার ছিঁচকে চোর নও।

— খুব তফাৎও নেই। আমাদের চোরেদের কোনো বিবেক নেই, ঐ পকেটমার থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত। বলতে পার চুরি আমার প্লান B। দরে না পোষালে বাধ্য হয়ে, আমাদের কাছে খুব বেশি অপশন তো থাকেনা।

— বাবাকেও দিয়েছিলে ? দর ?

— হ্যাঁ, ফোনে। দশ লাখের নিচে নামতে রাজি নন।

— এদিকে আমার client আট লাখের ওপর উঠবেনা। গত মাসেই নাকি সাতলাখে একটা কিনেছে। ওনার দোষ নেই, ভালোবাসার দাম তো কেউ দেয় না।

— ভালোবাসা ? তাহলে সমু ? কোনো দাম নেই ?

— না, ও আমার মনের মধ্যে আছে। যখন আয়নায় নিজেকে দেখি একটা গালে টোল পড়া মুখ আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসে।

— এত ভালোবাসি এত যারে চাই, মনে হয়না তো সে যে কাছে নাই . . .

— নিশ্চই তোমার মত কোনো US ললনাকে বিয়ে করে সংসার করছে।

— একবার ফোন করো না কেন ? হয়তো ও তোমার অপেক্ষায় আছে।

— নাঃ, একতরফা প্রেমের এইতো সুবিধে। প্রত্যাশা নেই, প্রত্যাখান নেই, বেদনা নেই, কিন্তু মনের ভেতরে তাকে একটু একটু পাওয়া। ও আমাকে তেমন করে আদর করে ঠিক যেমনটা আমি চাই।

— (ক্ষণিক অস্বস্তিকর নিস্তব্দতা)

— একটা কথা বলব ?

— (যেন হঠাৎ জ্ঞান ফিরে পেয়ে)

— চটপট বলে ফেল। হাতে সময় কম।

— কত দিতে পার ঘড়িটার জন্য ?

— সাড়ে চার, না পাঁচ লাখ।

— আমি যদি বাবাকে রাজি করাই ?

— কেন ? ভয় পাচ্ছ ? যদি ওদের আঘাত করি ?

— দেখ, চুরি করলে তো তোমার ঘড়িটা ফ্রী।

— নেয্য দাম দিতে শুভা কখনো পিছপা হয়নি। কিন্তু সময় খুব কম, client এর ফ্লাইট পরশু।

— কাল সকাল দশটায় ফোন কর। সব ঠিক থাকবে।

— প্রমিস ?

— প্রমিস।

— সত্যি, আমি আমার বাবাকে।

— এত ভালবাসিনি . . .

— (জানলার বাইরে মৃদু দিনের আলো দেখা যায়)

— সূর্য উঠছে, একটু পরেই আকাশটা লাল হয়ে যাবে। আমাকে পাইপ বেয়ে নামতে হবে।

— দাঁড়াও, আর একটা কথা . . .

— (শুভা ফিরে আসে)

— কি ?

— সমু। বললাম তো সব।

— এবার আমার কথা।

— তোমার কথা ?

— আমার পুত্র সৌম্য, বয়স সাতাশ, উচ্চতা পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি, সুদর্শন, সুশিক্ষিত, গবেষক এর জন্য সুন্দরী, সুশিক্ষিতা পাত্রী চাই।

— S N Sarkar, 3/19 Southern Avenue

— কোথায় বেরিয়েছে ? বাবাকে বল চিঠি দিতে। তোমাদের রাজজোটক।

— বললাম তো। সমু , ধীর স্থির, কেমন কিউট। ঠিক বলেছ, গালের টোলদুটো অসাধারণ। চোখদুটো ওঃ টেনে নেয়।

— ও দেখা হয়েছে। নিশ্চই love at first sight। কবে হচ্ছে বিয়ে ? My best wishes

— আর তুমি, একদম ছেড়ে দেবে ?

— আমার আর কি অধিকার ? একটা কাটখোট্টা ছন্নছাড়া মেয়ে। তুমি ওকে খুব ভালবাসবে, ভাল রাখবে, যেমন তোমার বাবাকে বাসো।

— জেনেটিক্স তো উল্টো বলে। Opposites are a better match।

— Life is not science madam । তোমার কি মনে হয় রাজার সঙ্গে ভিখারির রাজজোটক মিল হবে ?

— ওকে বিয়ে কর, ওর বিদেশে কাজের ইচ্ছা পুরণ হবে ।

— তুমি খুশি হবে ?

— ভীষণ । সমুর মত innocent ছেলের জন্য তোমার মত মেয়েই চাই ।

— জিগ্যেস করলে না সমু কি চায় ?

— ওর আবার কি চাই । এত ভাল মেয়ে, বনেদি পরিবার ।

— দেখা হয়েছে । গত জুলাইতে কলকাতা গিয়েছিলাম ।

— আমাদের দুই পরিবার তো গদগদ । ডিসেম্বরে বিয়ে ঠিক করে বসল ।

— তাহলে ?

— ও আমাকে একবার দেখা করতে বলল । আমি তো খুশিতে আটখানা । কিন্তু একটা কেমন খটকা লাগল । ওর মন যেন অন্য কোথাও ।

— বাবুকি প্রেম করে বসে আছেন ?

— তাই তো মনে হল । সুভদ্রা সান্যাল । চেনো নাকি ?

— না ।

— না না পুলিশকে লাগাব না ।

— আমার নাম সুভদ্রা নয় ।

— একটু ছেলে ছেলে, ভীষণ সাহসী, পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায় । যে কোনো কারোর বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বিশেষ করে ট্রেন থেকে ।

— না না, ওর career?

— US এসে ছিল কনফারেন্সে, তেমন ভাল লাগেনি । দিল্লিতে একটা ভাল রিসার্চ পসিশন পেয়েছে । আর একটা পুরনো ট্রেনের টিকিট যত্ন করে পার্সে রেখে দিয়েছে ।

— বোকা, হাঁদা, গঙ্গারাম ।

— কে ?

— জাস্ট ওকে বিয়ে করে নাও । এইসব ছেলেদের না মনের কোনো জোর নেই । একবার ছাঁদনাতলায় নিয়ে যাও, দেখবে বাবু গুটি গুটি কেমন পোষা পাখিটি হয়ে গেছে ।

— হুঁ, ওর বাবা মারও খুব ইচ্ছে । আমারও জিভে জল, কিন্তু ও ঐ টিকিটটার দিকে এমন করুণ চোখে তাকিয়ে ছিল ।

— সেন্টিমেন্ট সেন্টিমেন্ট, এর কোন দাম নেই । আমি কুৎসিৎ, বাইরে ভেতরে দুটোই ।

— ওর একটা মেল আজই এলো, লিখেছে জানিনা কতদিন, কিন্তু ঐ দুরন্ত মেয়েটার জন্য অপেক্ষা করতেও বেশ লাগছে।

— এই ফালতু বকবক বন্ধ কর। এরপর পুলিশের মার খেতে হবে। তুমি সমুকে বাঁচাও।

— ওর জীয়নকাঠি তো কাছে পিঠেই আছে। আমি কেন ?

— কথা দাও।

— কি ?

— তুমি ঐ অবাধ্য শুভাকে বোঝাবে।

— OK, কিন্তু ঘড়িটা ?

— সকাল দশটায় সাড়ে চার লাখ ক্যাশ।

— হুম।

— আর একটা কথা, গতবার বাবার জন্যে একটা ল্যাপটপ নিয়ে গিয়েছিলাম। বাবা খুলেও দেখেনি। ওটাও বাবা দিয়ে দেবে।

— কেন ?

— বাঃ বন্ধুর বিয়েতে যেতে না পারলেও গিফটটা তো দিতেই হবে।

— (দুজন স্টেজের সামনে এসে দর্শকদের অভিবাদন করে)

** সমাপ্ত **

অভিজিৎ মুখার্জি কুঁড়েমির আর এক অপরিচিত নাম। উনি খিদে পেলে তবেই জাগেন আবার খেতে খেতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। এর মধ্যে বন্ধু পরিজন বায়না করলে একটা আধটা আকাশ কুসুম গড়ে ফেলেন।

জীবনের ক্যানভাসে
সুজয় দত্ত

এক বাক্স চকলেট
সুজয় দত্ত

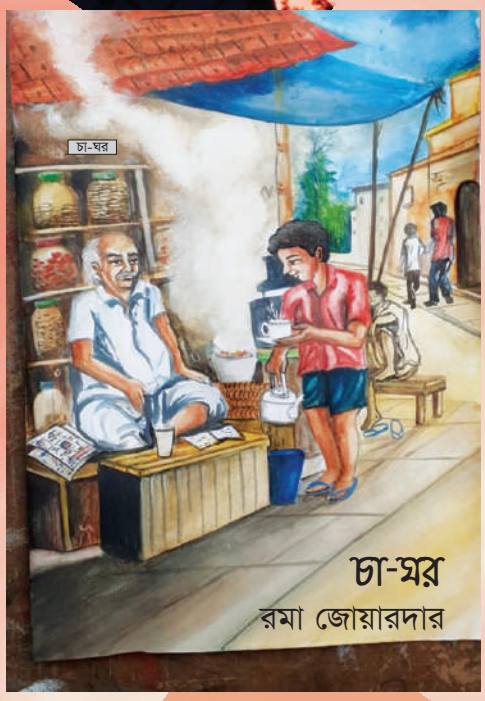

চা-ঘর
চা-ঘর
রমা জোয়ারদার

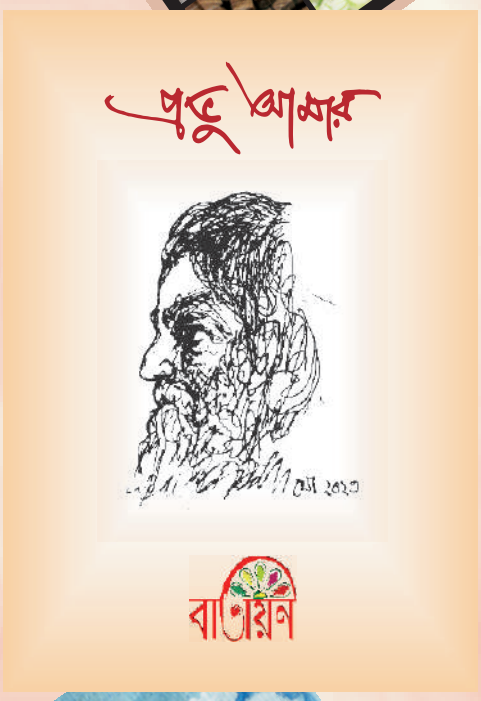

প্রভু আমার
বাতায়ন

ধুলো ওড়ার বিকেল
সঞ্জয় চক্রবর্তী

মেঘযাপন
সঞ্জয় চক্রবর্তী